পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি-২০১১- ডিসেম্বর ২০১১

জিন-বদলানো শস্য খাদ্য
শক্তি-পারমানবিক শক্তি
ভূ-উষ্ণায়ন বিতর্ক
আমরি-হত্যাকান্ড পি পি পি কর্মসূচী
মাদক-পানীয়-আইনী বনাম চোলাই বিষমদ
বিজ্ঞান-সমাজ-মানুষ-পরিবেশ ভাবনা
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট
দখল করো ওয়াল স্ট্রীট

পশ্চিমবঙ্গে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট না করার রাজ্য সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত

গত কয়েক দশক ধ'রে পশ্চিমবঙ্গে অ্যান্টিনিউক্লিয়ার আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল, এরাজ্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো চলবে না। শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং তার মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" সেই আন্দোলনের শরিক ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষও পারমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে। কাজেই, পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার যে দীর্ঘদিন ধ'রে উচ্চারিত নাগরিকদের এই দাবিকে মর্যাদা দিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করি, রাজ্য সরকার তার এই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে অবিচলিত/অটল থাকবে, প্রো-নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট লবি-র চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না এবং একটি অ-নিউক্লিয় শক্তি নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্ত ভারতের অন্য রাজ্য সরকারগুলোর কাজেও অনুসরণযোগ্য উদাহরণ।

সম্পাদক মন্ডলী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১-৪ ☐ জানুয়ারি- ২০১১-ডিসেম্বর-২০১১

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১-৪
জানুয়ারি-২০১১-ডিসেম্বর ২০১১
☐
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ
কলকাতা ৭০০ ০৮৯
☐
মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা
☐
Vigyan O Vigyankarmi
Rn. No. 34929/79
☐
Vol. XXXIII No. 1-4
January 2011-December 2011
☐
Communication :
C/O Avijit Lahiri
P252 Lake Town, Block A
Kolkata 700 089
☐
Website : www.scienceandsocietyinbob.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		৫
ক্রোড়পত্র ঃ জৈবপ্রযুক্তি জিনপ্রযুক্তি জিন - বদলানো (GM) শস্য খাদ্য		৭
জীন প্রযুক্তির খাস-খবর	শুভাশিস মুখোপাধ্যায়	৯
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি	শুভ্র কেতন বসু	১৪
ফসলের জাত উদ্ভাবনে প্রথাগত প্রজনন, আসিসট্রেড ব্রিডিং ও জিন পরিবর্তিত শস্য	অনুপম পাল	১৯
ভারতের জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিল	পুষ্প মিত্র ভার্গব	২৭
বিশেষ আলোচনা ঃ		
শক্তি সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্ব বনাম ভারত	রবীন ব্যানার্জি	২৯
ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি ঃ সাম্প্রতিক হালচাল	অনন্তরামন শ্রীনিবাস ও সঞ্জয় মিত্র	৩৫
বিশেষ নিবন্ধ ঃ		
ভূ-উষ্ণায়ন ও হকি স্টিক বিতর্ক	কুমারেশ মিত্র	৩৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ঃ একটি প্রস্তাবনা	মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	৪২
দৃষ্টিভঙ্গি ঃ		
বিজ্ঞান-সমাজ-মানুষ ও পরিবেশ — একটি ভাবনার রূপরেখা	সুমিত ঘোষ	৪৬
সাময়িকী ঃ		
রুগীর নিরাপত্তা ঃ ভুল থেকে শেখা	অসীম চ্যাটার্জী	৪৯
স্বাস্থ্যে পণ্যায়ন ঃ এখন	উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪
বিষমদের আয়নায়	রবীন মজুমদার	৬০
চোলাই ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা	শুভব্রত নিয়োগী	৬৭
সংগঠন সংবাদ ঃ		
আলোর পথযাত্রী	পূরবী ঘোষ	৭১
স্মরণ ঃ		
শ্যামলীদি	প্রদীপ দত্ত	৭২
অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়ে	পূরবী ঘোষ	৭৪
ন হন্যতে ঃ শর্মিলা ঘোষ স্মরণে	শিবু	৭৬
বাদল সরকার ঃ বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা	সুদেব সিংহ	৭৭
পরিক্রমা ■ অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট ■ আমরির বীভৎস হত্যাকান্ড - বহু প্রশ্নের উত্তর চায়		৭৯

অক্ষরবিন্যাস ঃ গ্রাফিক আর্ট , কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

With Best Compliments From :-

A WELL WISHER

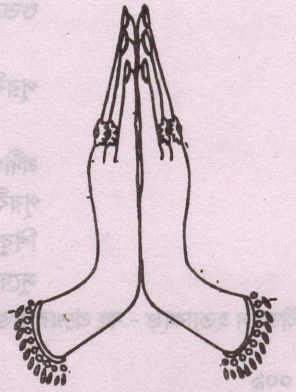

আমাদের কথা

৩৩ তম বছরের বি ও বি প্রকাশিত হল। আমরা অনুভব করি বি ও বি' চর্চার যা বিষয়, খুব উদারভাবে বললে, সমাজ ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন, তার প্রয়োজন বেড়েছে বই কমেনি। বিজ্ঞানকে-বিজ্ঞানের সুফলকে সামাজিক উন্নতিতে, স্থিতিশীল উন্নয়নে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে, যান্ত্রিকভাবে তা করা যায় না, চর্চায় ডুব দিতে হয় - এ প্রত্যয় আমাদের আরও বেড়েই গেছে। চারপাশের ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। সমাজ মানুষ ও পরিবেশের তোয়াক্কা না করে বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' অভিশাপও আমরা বরণ করে নিতে পারি। ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে এর একটা পরম্পরাই তৈরী হয়ে গেছে বলা যায়।

দীর্ঘদিন পরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে নির্বাচনেরর মাধ্যমে। মানুষ উন্মুখ ছিল পরিবর্তন আনতে। কিন্তু এটা যাতে শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ না ভোলায়, তার জন্য সরকারকে যেমন যত্নশীল ও উদ্যোগী হতে হবে, রাজ্যবাসীকেও তেমনি সর্তক সহযোগী হতে হবে। আমাদের কাজ শেষ, এবার যা কিছু করার তা সরকারই করবে, আমরা আবার ঘুমোতে চললাম - এমনটি হলে পুরনো ব্যাধিগুলোই জোরদার জেঁকে বসবে।

নতুন রাজ্যসরকারের এই আট-ন'মাসের সময়কালে ঘটনার ঘনঘটা চলেইছে। ঘটমান বর্তমানের জটিলতা সরিয়ে রাজ্যের মানুষের জীবনের চালচিত্রে অভিমুখের বদল সত্যিই সূচিত হল কিনা, তা বোঝা সহজ নয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে তা আশা করাও হয়তো ঠিক নয়, তবু মতপ্রকাশ ও ভাবনা-চিন্তার আদানপ্রদানে একটা উদার-সুস্থ বাতাবরণের লক্ষ্যে, সেরকম প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাও উচিত নয়।

বিজ্ঞান ও সমাজের মেলবন্ধনের নিরিখে নতুন রাজ্য সরকারের কিছু পদক্ষেপ আমাদের কাছে ইতিবাচক মনে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ ও অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাজ্যে পরমানু-বিদ্যুতের চুল্লী স্থাপন না করার প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত তেমনই একটি উদাহরণ। খুচরো ব্যবসায়ে ৫১ শতাংশ বিদেশী পুঁজির অনুমোদনের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের সরকার বিপুল সংখ্যক ভারতীয় খুচরো ব্যবসায়ীকে খানিকটা অন্তত আশ্বস্ত করতে পেরেছে। ভারত সরকার যখন কৃষিতে ব্যাপকভাবে জিন-পরিবর্তিত শস্য সব্জির প্রবর্তনে উন্মুখ, তখন নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে জিন বদলানো ধানের পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদন স্থগিত রেখে সংশ্লিষ্ট কাজের জৈব-নিরাপত্তার ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা করতে কমিটি নিয়োগ করেছে। অনুরূপভাবে, যত্রতত্র মোবাইল টাওয়ার বসানোর ব্যাপারেও একটি কমিটিকে পর্যালোচনার ভার দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শেষোক্ত দুই কমিটি সরকারের কাছে রির্পোট জমাও দিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ব্যাপারেও পর্যালোচনা করার জন্য বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তাড়াহুড়োকে প্রতিহত করে তিস্তার প্রকৃত জলপ্রবাহের অবস্থা পর্যালোচনা করাও অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু এগুলি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র, আশা করা যাক পরবর্তী সুষ্ঠু পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সর্বোত্তম নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে এগিয়ে যাবে।

এসবের পাশাপাশি এমনও অনেক বিষয় ও ঘটনা আছে যাতে মন ভারাক্রান্ত, বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হাসপাতাল নামধারী আমরি-তে খোদ কলকাতার বুকে, আগুনে-বিষে ছটফট করে ৯৩ জন অসহায় রোগীর ও কর্মীর মৃত্যু কিংবা চোলাই বিষমদে আকস্মিক মৃত্যুর কারণে ১৭৩ টি পরিবারের বিপন্নতা, ঋণজালে জর্জরিত কৃষকের আত্মহত্যা বা হাসপাতালে নাগাড়ে শিশুমৃত্যু ইঙ্গিত দেয় যে ভেতরের পচন এখনও ক্রিয়াশীল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকের উপর শারিরীক হামলা - এগুলো অনভিপ্রেত ও পীড়াদায়ক। বিগত সরকারের আমলে দলবাজি, নিগ্রহ খুনোখুনি অনেক দেখেছে সয়েছে এরাজ্যের মানুষ। দলীয় কর্মী, শিক্ষকনেতা ও ছাত্রনেতাদের ক্ষমতার চোলাই-এ নেশাগ্রস্ত উন্মত্ততায় তিতিবিরক্ত হয়ে মানুষ তাদের পরিত্যাগ করেছে। আশা করা যাক নতুন সরকার এই ভুলের ফাঁদে পা দেবে না। শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষির মত বৃহৎ ও জটিল ক্ষেত্রে রোগ সারাতে ধৈর্যশীল সময় দরকার ঠিকই কিন্তু পরিবেশ আতঙ্কমুক্ত থাকা দরকার। ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যে বি ও বি দু একটি ক্ষেত্রে পর্যালোচনার প্রয়াস রাখছে এ সংখ্যায়। প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্যই।

পত্রিকা বিষয়ে দু-চার কথা। একসময় আমরা ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহার করতাম। টেকনিক্যাল কারণে বিগত কয়েক বছরে তার থেকে বিচ্যুত হয়েছি। কোন রচনায় বাংলা সংখ্যা, কোনটিতে বা ইংরেজী -এ রদ করা গেলনা। বানানের বেলাতেও সমতা আনার চেষ্টায় বিরত থাকতে হল। পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আরও একটি কথা, বি ও বি তে লেখা প্রকাশিত হয় - রচনার প্রসাদগুণ ও যুক্তির নিরিখে, লেখকের মতের সঙ্গে সহমত না হলেও। লেখকদের সকলকে ধন্যবাদ।

ক্রোড়পত্র ঃ

জৈবপ্রযুক্তি জিনপ্রযুক্তি জিন - বদলানো (GM) শস্য খাদ্য

এক্ষুনি ভারতে জিন বদলানো শস্য সব্জীর চাষ না করতে পারলে গোটা পৃথিবীই খাদ্য সংকটে পড়ে যাবে - এমনটাই বলতে চাইছেন ভারত সরকার। জল-জমি-পরিবেশ-মানুষ তাতে উপকৃত হবে কিনা তা পর্যালোচনার তর সয় না তাঁদের। হতেই পারে, কারণ তাঁদের পাখির চোখ বাণিজ্য - কৃষক নয়, পরিবেশ নয়, মানুষ নয়। তা যদি নাই হবে তাহলে এ-দেশে জিন-বদলানো শস্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা মাঠচাষ ইত্যাদি নিয়ে জৈবনিরাপত্তার লক্ষ্যে সরকারীভাবেই যে সব সাবধানতার বিধিব্যবস্থা আছে, তা রাজ্যে রাজ্যে বার বার লঙ্ঘিত হয় কি করে? এ রাজ্যেও বেশ কয়েকবার তা ঘটেছে। একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের মদতে দেশী-বিদেশী বীজ কোম্পানি এ খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। কৃষককে মানুষকে অন্ধকারে রেখেই চলছে তাদের অভিযান, যদিও তাদেরই উন্নতির জন্যই নাকি যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন! পৃথিবী জুড়ে কিন্তু চলছে আলোচনা-বির্তক। আমাদেরও পক্ষে সেটা খুবই জরুরী। তাই এই ক্রোড়পত্র।

জিন-বদলানো শস্যের সমর্থক জৈবপ্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের কয়েকজনকেও অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের কেউই শেষ পর্যন্ত লেখা দিতে পারেননি - সময়াভাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন বাংলায় লিখে কি লাভ? কে পড়বে, ক'জন জানে বোঝে? কিন্তু খাদ্য খাব আমরা সবাই। চাষ করবেন কৃষক।

জিন-বদলানো ফল-ফসল ও আনুষঙ্গিক শিক্ষা-গবেষণা-কৃষিব্যবস্থাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব তথা চিরসবুজ বিপ্লবের আগমনী গাইছেন। ভারত-মার্কিন কৃষিজ্ঞান-চুক্তি (AKI) মোতাবেক এগোতে চাইছেন সরকার। সেই প্রেক্ষাপটে জিন বদলানো শস্যের সম্ভাবনা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন শুভাশিস মুখার্জি ও শুভ্রকেতন বসু। ফসলের জাত-উদ্ভাবনের প্রযুক্তিগত দিক তুলে ধরেছেন অনুপম পাল, অনুসন্ধান করেছেন আধুনিক প্রযুক্তির কোথায় কতটুকু গ্রহনীয়। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট জৈবপ্রযুক্তিবিদ পুষ্প মিত্র ভার্গবের রচনার (দ্য হিন্দুতে সম্প্রতি প্রকাশিত) বঙ্গানুবাদে পাওয়া যাবে ভারতীয় জৈবপ্রযুক্তি অধিকার (BRAI) বিল -এর বিবিধ 'সদিচ্ছার' হদিস যা যে কোন মূহুর্তে আইনে পরিণত হতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত। আপাতত এটুকুই। পাঠক-প্রতিক্রিয়া প্রার্থনীয়।

স.ম.

বইমেলায় বিওবি

২০১২-এর ৩৭ তম কলকাতা পুস্তক মেলার আসর এবার মিলন মেলায়।
দৌড়ো দৌড়ি-সাজিয়ে বসা আর প্রকৃতির-অসহযোগ সহযোগে এই মেলায় থাকছে
বিওবি, যথারীতি ছোট্ট টেবিল স্পেস-এ। উদ্দেশ্য কাঙ্খিত-জন অথবা হারিয়ে
যাওয়া-হারাতে বসা কিংবা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া বন্ধুদের
সঙ্গে নতুন করে চেনাচিনিটুকু।
এইই তো বিওবি-র পড়ে পাওয়া
চোদ্দো আনা...।

জীন প্রযুক্তির খাস-খবর

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

sm.bmbg@gmail.com

'শিল্প বিপ্লব' এর পর প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল সম্পর্কে মানবজাতির জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হয়েছে। ততই প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল সম্পর্কে সামাজিক মান্যতাও বেড়েছে সমান তালে। 'শিল্প বিপ্লব' এনেছে পণ্যের বৈচিত্র্য আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের প্রাচুর্য। এই বিপুলতার হাত ধরে এসেছে অখন্ড অবসর, বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ। এসবই ঘটেছে কেবল তাদের জন্য, যারা গৌরি সেনের টাকা নগদে চুকিয়ে তবেই পণ্য, বিশ্রাম বা প্রমোদ কিনতে পেরেছে। 'শিল্প বিপ্লব'-এর দেশ ইংল্যান্ড-এ বেড়েছে বেকারি - ব্রিটেনের গরীব আমজনতা 'ম্যালেরিয়ার রাজ্য' ভারত, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা এমনকি প্রশান্ত মহাসাগর - অতলান্তিকের ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোতেও পাড়ি জমিয়েছে পেটের ভাত আর পরনের কাপড়ের সন্ধানে। 'শিল্প বিপ্লব' ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানির মতো অতিকায় বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে অফুরন্ত মুনাফা এনে দিলেও ব্রিটেনের চাষী, শ্রমিকদের অবস্থার সেই একই মাত্রায় উন্নতি হয়নি - লর্ড, ব্যারনবৃন্দ বিঘে বিঘে জমির মালিক হয়ে টাকার কুমিরে পর্যবসিত হয়েছে।

কী গরীব, কী বড়লোক, প্রত্যেককেই দুবেলা দুমুঠো দানাপানি পেটে চালান করতে হয়। 'শিল্প বিপ্লব'-এর পণ্য (হরেক রং এর জামা-কাপড়, ছুরি-কাঁচি-আলপিন বা রেডিও-টেলিভিশন-জামা-কাপড় কাচার যন্ত্র ইত্যাদি) দিয়ে কুঁড়েমি করা চললেও তা দিয়ে দিনের শেষে পেটের ক্ষিদে মেটেনা। আবার পেটের ক্ষিদে এমন এক বস্তু, যা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অনুভব করে, সবাইকেই খাবার জোগাড় করতে হয়। চাষী নিজের, তার পরিবারের সদস্যদের খাদ্য ছাড়াও যারা অকৃষিকাজে নিযুক্ত, তাদের জন্যও উৎপাদন করে। তাই কম পরিশ্রম করে, বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকদিনই ভাবিত ছিলেন।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেই আজকাল গবেষণার টাকা জোটেনা। 'শিল্প বিপ্লব' এর সময়কালে অফুরন্ত টাকার মালিক এবং শস্তা শ্রমের জন্য সদা প্রস্তুত নিরবচ্ছিন্ন শ্রমিকের শ্রমের ওপর নির্ভর করে লর্ড এবং ব্যারনবৃন্দ অবসর যাপন করতেন বিজ্ঞান চর্চা করে (লর্ড কেলভিন ইত্যাদিরা)। তাঁদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটানোর টাকা তাঁরা জোগাড় করতেন উপনিবেশগুলোতে তাঁদের যে লগ্নী ছিলো সেই অর্থ থেকে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানচর্চা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে- প্রতিষ্ঠানের অর্থ জোগাড়ের অন্যতম উৎস বণিক-শ্রেষ্ঠীদের লগ্নীর টাকা।

খাদ্য-উৎপাদন-প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের যেমন কৌতূহল, উৎসাহ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কাজ করেছে, তেমনি বণিক-শ্রেষ্ঠী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বণিকদের যুক্তি খুবই সরল। যে পণ্য (এখানে খাদ্য) সবাই বাধ্য হয়ে, মূল্যের পরোয়া না করে কিনতে প্রস্তুত থাকে, সেই পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিপননের একচেটিয়া অধিকার পেলে মুনাফার প্রশ্নটির সারাজীবনের জন্য ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যেতে পারে। অতএব এলো খাদ্য-প্রযুক্তি, কৃষি-প্রযুক্তি, জৈব-প্রযুক্তি, জীন-প্রযুক্তি। এই হলো এক কাহিনীর নতুন করে শুরু - যার উত্তরকথা একটু গেয়ে নেওয়া দরকার। খাদ্য উৎপাদন-এ বিভিন্নতা আনা, খাদ্যকে তার স্বাভাবিক জীবনকালের চেয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করে রাখার প্রযুক্তিকে মোটা দাগে খাদ্য-প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। যেমন আচার সংরক্ষণের জন্য রাসায়নিক মেশানো, বা মাছ শুকিয়ে রাখা ইত্যাদিকে আটপৌরে রান্নাঘরের টোট্‌কা হিসেবে ভাবলেও তার মূলনীতি অবশ্যই প্রযুক্তি সফল প্রয়োগ। একই মাপের কৃষিক্ষেত্রে বেশি উৎপাদন, উৎপাদনের সময় সংক্ষেপ করা, সুস্বাদু খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদিকে বলা যেতে পারে কৃষি প্রযুক্তি। বাগানে দুটি বিভিন্ন রং-এর গোলাপ ফুলের সংকর করে নতুন রং-এর ফুল ফোটানো এমন এক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। মানবজাতি কৃষিকাজ উদ্ভাবন করার পর থেকেই শস্য উৎপাদনে এই পদ্ধতিতেই বৈচিত্র্য আনে, উদ্‌বৃত্ত শস্য বা খাদ্য সংরক্ষণের কৌশলও উদ্ভাবন করে। এই দুটি প্রযুক্তিই মানবজাতির সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা

নিয়েছে, তারা সময়ের পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে মানবজাতির সাধারণ জ্ঞানভান্ডারে অর্ন্তভূক্ত হয়ে পড়েছে। এইবার উত্তর কথার শেষ এবং নতুন এক উত্তরকথার নান্দীমুখ শুরু করা যেতে পারে।

নতুন পূর্বকথা ঃ

আদি মানবের বিজ্ঞানচিন্তা-বিজ্ঞানচেতনার ফসল হিসেবে আজকের মানবজাতি পেয়েছে কৃষিকাজ, বীজ, কৃষি পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান। আদি কৃষক থেকে আজকের কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা বুনো প্রজাতির অনিয়মিত উৎপাদিত অপেক্ষাকৃত কম খাদ্যগুণ সম্পন্ন গাছ-গাছড়াকে কৃষি কাজ যোগ্য নিয়মিত এবং স্থায়ী গুণসপন্ন খাদ্য-গুণ-সমৃদ্ধ ফসলে রূপান্তরিত করতে পেরেছি। এই রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে অনেক প্রজন্ম ধরে, দীর্ঘস্থায়ী এক ধারাবাহিক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতি, প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, মানুষের প্রচেষ্টায় কৃষিজাত ফসলগুলোও তেমনি স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। এই সমস্ত ফসলগুলোর পরাগ একই পরিবারভুক্ত অন্য ফসলের সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে যে সব নবীন প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে, প্রকৃতিও তাদের প্রায় সকলকেই তার জীন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অঙ্গনে সসম্মানে ঠাঁই দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখে প্রথমে আসে 'উচ্চফলনশীল' বীজ থেকে উদ্ভুত ফসল। এই বীজগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খাদ্য, জল ইত্যাদি গ্রহণ করে অচিরেই ফুলে-ফেঁপে ওঠে - কম সময়ে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। ঠিক অনেকটা ব্যায়ামবীরদের মতো - অতিরিক্ত দেহচর্চা এবং সঙ্গে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আহার আর বিশ্রাম। এই বীজগুলোকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষি-প্রযুক্তি। এতে রয়েছে কিছুমাত্রায় কৃত্রিমতার ছোঁয়া। যন্ত্রমানুষের হাতের মতো, যা মানুষের হাত যতটা শক্তি প্রয়োগে সক্ষম, তার চেয়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে পারলেও তুলি ধরে ছবি বা কলম ধরে কবিতা লিখতে পারে না।

প্রথম প্রজন্মের কৃষিকাজ থেকে দ্বিতীয় ধারার উচ্চফলনশীল বীজে পৌঁছাতে মানবজাতি সময় নিয়েছে বেশ কয়েক হাজার বছর। তারপর যেন শুরু হয়েছে একাঙ্ক নাটকের 'নক্-আউট' প্রতিযোগিতা। সময়ের পরীক্ষায় সুস্থিতভাবে উর্ত্তীণ হওয়ার দায় নেই - শুধু রয়েছে কিছু চট্‌জলদি সমাধান বাতলানোর পদ্ধতি প্রকরণ।

একাঙ্ক প্রতিযোগিতার মঞ্চে পর্দা উঠলে অতঃপর প্রবেশ ঘটলো জৈব প্রযুক্তির। জৈব প্রযুক্তির উদ্‌গাতাদের ভাষাতেই বলা যায় যে এই জৈব-প্রযুক্তি হলো এমন এক প্রযুক্তিগত প্রয়োগ যা প্রাণকে ব্যবহার করে। সেই প্রাণ হতে পারে উদ্ভিদ, হতে পারে অনুজীব বা পরজীবী বা আস্ত একটি প্রাণী বা প্রাণী থেকে জোগাড় করা প্রাণ রাসায়নিক অনুসমূহ বা কোষ বা কলা। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাণের এমন এক রূপান্তর যা থেকে পণ্য বা বিশেষ কাজে ব্যবহারের দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে সুমিষ্ট ফলের কলা থেকে প্রাণ রাসায়নিক অনু সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে তাকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে তার থেকে চারা বানিয়ে এমন একটি ফলের কলা থেকে বেশ কয়েক হাজার চারা বানানো সম্ভব) সেই চারা মাটিতে রোপন করলে এই সব চারা থেকে উদ্ভুত ফলগুলো তাদের আদি ফলটির মতো অবিকল শুধু যে দেখতে হবে তাই নয় - স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি বিচার করলে তারা প্রত্যেকেই হবে আদি ফলটির এক একেকটি হুবহু সংস্করণ। এটাই হলো জৈব প্রযুক্তির মাহাত্ম্য। এর ফলে আমরা পেয়েছি মরসুমি সব্জির বদলে সারা বছরের সব্জি, পেয়েছি নানান বাহারি ফুল, ক্যাকটাস ইত্যাদি। যখন এই প্রযুক্তি কৃষি-কাজের দ্রব্য, অর্থাৎ ফসল-এ প্রয়োগ করার কথা উঠলো, তখন অনেকে এই প্রযুক্তির নাম করণ করলেন 'সবুজ জৈব-প্রযুক্তি'।

জীন-প্রযুক্তি হলো গুণগতভাব একেবারেই এক ভিন্ন প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রজাতির মধ্যে অ-প্রত্যাহার যোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই প্রযুক্তি খাটিয়ে কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীন-সমষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির জীন (যেমন তামাক গাছে জোনাকি পোকার আলোর উৎসের জন্য দায়ী জীন, বা রেশম গুটির মধ্যে মাকড়সার জাল বোনার জীন ইত্যাদি) চালান করে সেই পরক জীনটির প্রকাশ নিশ্চিত করা হয়। সাবেকি কৃষিকাজ বা সংকর বীজ প্রযোগের চেয়ে এই জীন-প্রযুক্তি মৌলিকভাবে পৃথক, কেননা এই পদ্ধতিতে স্বাভাবিক প্রজননের মাধ্যমে জীন-সমষ্টি যেমন নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে পারতো, পরক জীনের উপস্থিতিতে এখন

জীবটির জীন সমষ্টি আর সেইভাবে বিন্যস্ত হতে পারে না। এই নতুন বিন্যাসটি কৃত্রিমতা, প্রাকৃতিক পদ্ধতির দ্বারা অনুমোদিত একটি বিন্যাস নয়।

জীন-প্রযুক্তি যুক্তি-প্রতি যুক্তি

জীন-প্রযুক্তির প্রবক্তাবৃন্দ এই প্রযুক্তির সপক্ষে সওয়াল করার সময় নানা রকম সরল যুক্তি হাজির করেন। তাঁরা শুরু করেন প্রমাণিত তথ্য থেকে - তারপর তাঁরা ধাপে ধাপে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছোন যে জীন-প্রযুক্তি বিনা মানবজাতি না খেয়ে বেঘোরে মারা পড়বে। আমরা সংক্ষেপে তাঁদের যুক্তিজাল বিস্তার বা সওয়ালের প্রকৃতি নিয়ে দু-চার কথা বলি।

পৃথিবীতে এখন, যখন কেউ এই লেখাটা পড়া শুরু করলেন, ঠিক তখন মানবজাতির মধ্যে প্রায় ১১০ কোটি মানুষ অভুক্ত, ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যেই এই ধরাধামে মানুষের সংখ্যা ৮১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমান হারে প্রকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং কৃষিকাজ চলতে থাকলে ২০৩০ এর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ পেটপুরে দুবেলা খেতে পাবে। সবাইকে পেটভরে খেতে দিতে হলে দরকার ৫০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি। সেটা হয়ত কার্যত অসম্ভব তাই প্রয়োজন খাদ্য দ্রব্যের গুণমাণের বিপুল পরিমান বৃদ্ধি, যাতে কম খাদ্য গ্রহণ করলেও পুষ্টির অভাব ঘটবে না। কিন্তু সাবেকি কৃষিকাজ দিয়ে এই গুণমাণের বিপুল বৃদ্ধি অসম্ভব, কিন্তু জীন-প্রযুক্তি দিয়ে তা করা সম্ভব। যদি আমরা, ধরা যাক ধানের বীজে একটি পরক জীন ঢুকিয়ে দিয়ে ধানের বীজটিকে অতিরিক্ত প্রোটিনে সমৃদ্ধ করতে পারি, তবে আগে যদি ১০০ গ্রাম চাল খেলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি মিলতো, তো এখন ৭৫ গ্রাম চাল খেলেই সেই পরিমাণ পুষ্টি মিলবে। অথবা বলা যায় এই পদ্ধতিতে চারজন পিছু প্রয়োজনীয় খাদ্য দিয়ে ৫ জন মানুষ প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে। শুধু তত্ত্বের দিক থেকেই নয় সামাজিক এবং অন্যান্য দিক থেকেও এমন প্রকল্প যে যথেষ্ট আকর্ষনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তিধারা নিঃছিদ্র মনে হলেও আসলে এই যুক্তির ইমারতটি ময়দা ছাঁকার চালুনির মতো সচ্ছিদ্র! দুনিয়ার মানুষ অভুক্ত থাকছে খাদের গড় অপ্রতুল উৎপাদনের কারণে, ঘটনাটা মোটেই এমন নয়। বরং এখন পৃথিবীতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী তীব্র দুর্ভিক্ষ কমার দিকে, কিন্তু খাদ্যহীনতা ছোটো ছোট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলোর অনেক কটাই হয় দুর্গম অঞ্চলে অথবা অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক দিক থেকে কৃষি-বান্ধব নয়। বাকি অঞ্চলগুলো অবধারিত ভাবে বিশ্বের দরিদ্রতম অংশে অবস্থান করে। আবার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং খাদ্য-উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছোটো ছোটো অঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রায় চিরস্থায়ী। এই দুটি খাদ্য-ঘাটতি অঞ্চলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এখানকার আম-জনতা দরিদ্র এবং রাষ্ট্রের বন্টন ব্যবস্থা এই সব অঞ্চলে প্রায় অনুপস্থিত। বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। বাংলার আমলাশোল বা উড়িষ্যার কালাহান্দির কথাই ধরা যাক। ওখানে থাকে 'কটা পচা পচা আদিবাসি' (জনৈক সরকারি মুখপত্রের বক্তব্য) -ট্যাক্স পাওয়া যায় না এখান থেকে। ১৫ সপ্তাহের রেশন বাকি থাকে সেখানে। রাষ্ট্রের যে কোন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (যেমন হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রেশন দোকান, বাসরাস্তা, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, বিডিও দপ্তর .....) গড় পড়তা ৭-১০ কিমি দূরে। সেচের জল নেই, সরকারি মিনিকিট নেই, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ওষুধ নেই, অন্ত্যোদয় রেশন নেই - আছে শুধু অন্তহীন ক্ষুধা আর প্রতিশ্রুতি। এখানে খাদ্যভাবের কারণ খাদ্যের উৎপাদনহীনতা নয়, বন্টন ব্যবস্থার খুঁত, দুর্নীতি আর রাষ্ট্রের পক্ষে অবহেলা। জীন-প্রযুক্তি এই সমস্যার একটারও সমাধান দেয় না। অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদিত হলেও (যদি জীন-প্রযুক্তি তার নিশ্চয়তা দেয়ও) বন্টন ব্যবস্থা অবিকৃত অবস্থায় বহাল থাকলেও আমলাশোল আর কালাহান্দির মানুষদের ভাঁড়াড়ে খাদ্য সেই 'বাড়ন্ত' অবস্থাতেই থাকবে। ভারতে যেমন আমলাশোল, পৃথিবীতে তেমনি অবসাহারা আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চল। একটি মূলত রাজনৈতিক-অর্থনীতির সমস্যা তো আর জীন-প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সমাধান হওয়ার নয় - তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান সন্ধান।

এইবার আসা যাক খাদ্যদ্রব্যের গুণমান বৃদ্ধির প্রশ্নটিতে। এই প্রশ্নে গভীর ভাবে প্রবেশ করার আগে মোটা দাগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। বর্তমানের জীন-প্রযুক্তির প্রবক্তারাই জীন-প্রযুক্তিকে কয়েকটি প্রজন্মে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি হলো সেটাই যেখানে কোনও একটি ফসলের একটা বা কয়েকটা গ্রহনীয় প্রবণতাকে অনেকটা

বিবর্ধন করার জন্য পরক জীন আমদানি করা। ফসলের সমগ্র জীন-সমষ্টির মধ্যে যে পরক জীনটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, যদি সেই পরক জীনটি প্রবিষ্ট ফসলের মধ্যে ঐ সব গ্রহনীয় প্রবণতাকেই মাত্র বিবর্ধন করে এবং অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে তা পরক জীন হীন ফসলটির সঙ্গে একেবারেই সমতুল্য হয়, তবে জীন-প্রযুক্তি জাত ফসলটিকে প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল বলা হয়।

গত ৪০ বছর ধরে অনুশীলন করা জীন-প্রযুক্তি এতদিনে মাত্র কয়েকটা প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল ফলাতে পেরেছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের সাফল্য অনুমানের মাপকাঠি হলো সমতুল্যতা - অর্থাৎ স্বাভাবিক ফসল এবং জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের মধ্যে ঐ পরকজীন এবং ঐ পরকজীন যে ধর্মটি জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের মধ্যে প্রকাশ করে, এই দুটি বিষয় ছাড়া ঐ দুটি ফসল সর্বাংশে সমতুল্য। এই সমতুল্যতার বিষয়টি কয়েকটি প্রজন্মে স্থির থাকলেও যখন এই সমস্ত পরক-জীন বাহী ফসলের বীজ পরস্পরের সঙ্গে সংকর হয়ে ওঠে, তখনই ফসলের মান গুণ, অবয়ব এবং ধর্মে পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ একটিই ফসলের ক্ষেতের মধ্যে একই বীজের এক অংশের ফসল পাকে, ধরা যাক দুমাসে, কিন্তু ঐ ক্ষেতেরই অন্য অংশে ফসল পাকে তিনমাসে এবং তৃতীয় একটি অংশে ফসল আদৌও পাকে না। সমতুল্যতার মাপকাঠিতে এই জীন-প্রযুক্তিজাত ফসল তাই উত্তীর্ণ হতে পারে না। বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন প্রজন্মে ঐ ঘটনা ঘটে। তাই এই জাতীয় জীন-প্রযুক্তি-জাত বীজের জন্য একই রকম কৃষি পদ্ধতি চলবে না - আবার সফল কৃষিকাজের জন্য একই জাতের ফসলের জন্য একই রকমের কৃষিকাজের পদ্ধতিই হলো অভিপ্রেত। কৃষকদের যুগ যুগ ব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও তাই। কিন্তু এই 'বিজাতীয়' বীজগুলি কৃষিকাজের মৌলিক ভিত্তিভূমিরই বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

যে গ্রহনীয় গুণের বিবর্তনের জন্য প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল পাই সেগুলোতে রং, গন্ধ, চেহারা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সাময়িক পরিবর্তন আনা সম্ভব হলেও সেগুলো কিন্তু খাদ্যগুণ বা পুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আদিরূপ, প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে লভ্য ফসলের একেবারেই সমতুল্য। যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ভয়ঙ্কর আগামী দিনগুলোর হাড়-হিম-করা চিত্র এঁকে জীন-প্রযুক্তি-জাত খাদ্যের সপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা হয়, প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল আদতে সেই সমস্যার সমাধানে কোনও অবদানই রাখেনা!

মাঠ স্তরের পরীক্ষালব্ধ ফল, বেসরকারি বিজ্ঞানীদের নিরপেক্ষ গবেষণা এবং জীন-প্রযুক্তি বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলকে যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হিসেবে চালানো যাবেনা তা খাদ্যের কারবারিরা অচিরেই বুঝে যান। তখন তাঁরা দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের কথা বলতে থাকেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের পেছনের যুক্তির কথা জীন-প্রযুক্তি-জাত খাদ্য ফসলের অতিকায় সংস্থা, সিনজেন্টার (যা কিনা ভিন্ন রাষ্ট্রের দুটি বহুজাতিক সংস্থা, নোভার্টিস এবং এ্যাস্ট্রা-জেনেকার যৌথ মালিকানায় চলে) মুখ থেকেই শোনা যাক!

এই সংস্থার মতে বিজ্ঞানীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও, কীট-নাশক দিয়ে, সুসংহত কীট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে আমরা বাঁচাতে পারিনা। এর ফলে সারা পৃথিবীর উৎপাদিত ফসলের চল্লিশ শতাংশই পোকার আক্রমণে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা যত, তার জন্য ফসলের এই ক্ষতি সত্ত্বেও বিরাট মাপের খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমিত হার যা, সেটা মেনে নিলে এই ৪০ শতাংশ ক্ষতি অপূরণীয়- এই ক্ষতির ফলে ২০৩০ এর আশপাশে স্থায়ী এবং তীব্র খাদ্যাভাব অবধারিত। এই সমস্যার সমাধানে কীটনাশক প্রয়োগ যে পরিমাণে ফসল বাঁচাতে পারবে, তা যথেষ্ট নয়। ফসলকে কীটের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ জরুরি।

দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের ধারণা এসেছে ফসলকে কীটের আক্রমণ থেকে অভিনব জায়গায় রক্ষা করার পদ্ধতি থেকে। এই অভিনব পদ্ধতির ফলে জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল। দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল হলো সেই গুলো যেখানে আমরা এক প্রজাতির ফসলের জীন-সমষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রজাতি বা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রানীর জীন চালান করি। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা খানিকটা প্রাঞ্জল হতে পারে। মাটির

মধ্যে একটি বিশেষ অনুজীব পাওয়া যায় যার জীন-সমষ্টির মধ্যে এক জাতের জীন রয়েছে যারা কয়েকটি বিশেষ জাতের রোগ সৃষ্টিকারি ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এমন কিছু কিছু রোগ গম বেগুন বা তুলোকে আক্রমণ করে থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো মাটির অনুজীব থেকে প্রাপ্য এই বিশেষ জাতের জীন গুলোকে (যাদের অতি পরিচিত বিটি জীন নামে অভিহিত করা হয়েছে) যদি গম, বেগুন বা তুলোর জীন সমষ্টির মধ্যে একবার চালান করে দেওয়া যায় তাহলে ঐ জীন গুলো গম, বেগুন বা তুলোর বীজের মধ্যে রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা গড়ে তুলবে। আর বীজেদের অন্তর্নিহিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বিটি জীনের ফলে বহুগুণ বিবর্ধিত হয় তো ঐ সমস্ত বীজ কম কীটদষ্ট হবে - ফসলের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এখন কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের সঙ্গে তাদের আদিরূপের তুলনা করে সমতুল্যতার মাপকাঠি ব্যবহার করা যাবে না, কেননা জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলটির সমগ্র-জীন-প্রযুক্তিতে এখন এমন একটি বা কয়েকটি পরক জীন বর্তমান যা স্বাভাবিক জনন পদ্ধতিতে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত হওয়া অসম্ভব, কেননা অনুজীব এবং তুলোর জনন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের জনিকা কোষের চরিত্রে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। যদি আমরা নতুন করে বানানো ফসলকে পুরোনো, সময় দ্বারা পরীক্ষিত, জানা ধর্মের কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে না পারি, তাহলে ঐ নতুন ফসলের উৎকর্ষ, গুনমান বা ঝুঁকির পরিমান নির্দ্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব। ঠিক এ কারণেই বহু বিজ্ঞানী, বিশেষত যাঁরা এই প্রযুক্তির উদ্‌গাতা, তাঁরা নিজেরাই বিজ্ঞানী কুলের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে এই বিপজ্জনক পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিষয়ে জীব-বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পাওয়া বিজ্ঞানীরা দুটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলন করেছেন, যা আসিলোমার সম্মেলন নামে খ্যাত। প্রাণীর জীন গাছে চালান করে 'গিরগিটিয়া' বানানোর কৌশল প্রকৃতি অনুমোদন করেনা। ঠিক একারণেই হয়ত প্রকৃতি প্রাণ সৃষ্টির আদিতে প্রাণী কোষ এবং উদ্ভিদ কোষ এবং উভয়ের বংশগতি সংক্রমণের পদ্ধতিটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল তাই বলা যেতে পারে, ধর্ষণের সন্তান, যেখানে সৃষ্টিতে দু পক্ষের অনুমোদন নেই।

স্বভাবতই এমন ফসল কয়েকটা প্রজন্মের পরই তার 'কীট-নাশক' ধর্ম হারিয়ে ফেলে। কেন এরা ব্যর্থ হয় সে সম্পর্কে অল্প আলোচনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল নির্মানের পেছনে মূলত দুটি ভ্রান্ত ধারনা ক্রিয়াশীল। সেই ধারনার একটি হলো যে একটি জীন ফসলের একটি মাত্র ধর্মকে নির্দ্ধারণ করে। জীন-প্রযুক্তির শৈশবে যখন তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিলো সীমিত এবং প্রযুক্তিগত কৌশলও ছিলো নেহাতই প্রাথমিক স্তরে, তখন যে সমস্ত আদর্শ প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর এই সমস্ত জীন-প্রযুক্তিগত কৌশল প্রয়োগ করা হতো, সেগুলোর জীন-সমষ্টির বিন্যাস ছিলো সরল, জীনের পরস্পরের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের তীব্রতা ছিলো স্বল্প। সেই সমস্ত আদর্শ প্রানীর বা উদ্ভিদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে পরীক্ষালব্ধ ফলকে 'একটি জীন-একটি ধর্ম' এই তত্ব দিয়ে মোটের ওপর ব্যাখ্যা করা চলতো। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জীববিজ্ঞানীরা ক্রমশ আরও অনেক প্রাণী, অনুজীব, উদ্ভিদ এমন কি ২০০০ সালে মানুষের সমগ্র জীন-সমষ্টির পরিমাণ নির্ধারণে সমর্থ হয়েছেন। মানুষের জীন-সমষ্টি নিয়েই আলোচনা করা যাক। অন্যান্য অনেক নিরপেক্ষ পরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ নীরোগ অবস্থায় জীবনচক্র অতিবাহিত করলে ঠিক কতগুলি কাজ সম্পন্ন করে। যদি এমন প্রতিটি কাজ একটি করে জীন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তবে মানুষের জীন-সমষ্টিতে যতগুলি জীন থাকা প্রয়োজন, পরীক্ষালব্ধ ফল দেখাচ্ছে যে মানুষের জীন সমষ্টিতে সেই সংখ্যার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ জীন রয়েছে। এই তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জীন-সমষ্টির মধ্যে অবস্থান করে একটি জীন অবশ্যই একাধিক ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে। মোটা দাগে বলা যায় যে দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল মৌলিকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের দিক থেকে এক ভ্রান্ত ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় যে ধারনার ওপর দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তিগত ফসল প্রতিষ্ঠিত তা হলো যে একটি জীন কোনও প্রানীর জীন-সমষ্টির যে কোনও স্থানে অবস্থান করে একই কার্য সম্পাদন করবে। অর্থাৎ জীন-সমষ্টিতে অবস্থিত একটি জীনের কার্যকলাপ তার আশপাশের জীনের চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল নয় - আশপাশের জীন কোনও একটি জীনের কাজ কর্মের

ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। আনাবিক জীববিজ্ঞান দেখিয়েছে যে একটি জীন, জীন সমষ্টির বিভিন্ন অংশে অবস্থান করলে তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, কখনও বা তারা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কিছু জীনের উপস্থিতির কারণে তাদের নির্দিষ্ট কাজ আদৌ সম্পাদন করতে পারে না। এই দুটি পরীক্ষালব্ধ তথ্য পুরো দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল উৎপাদনের মৌলিক দর্শনের ভিত্তিভূমিকেই উৎপাটিত করে দিয়েছে।

জীন প্রযুক্তি প্রয়োগের বর্তমান পদ্ধতিটি হলো এমনই যে পরক জীন বা জীনগুলি যে প্রানী বা উদ্ভিদের জীন-সমষ্টিতে প্রবেশ করানো হচ্ছে, সেই প্রানীর জীন-সমষ্টির ঠিক কোথায় গিয়ে জুড়ে যাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। যা বলা যায় তা হলো এই পরকজীন জুড়লো বা জুড়লো না। যদি জুড়ে যায় তবে বিভিন্ন স্থানে জোড়ার সম্ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন। যে সব জীন অভিপ্রেত স্থানে জুড়লো না, তারা অভিপ্রেত কার্য করতেও পারে, নাও করতে পারে। কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রায় (৯ শতাংশ ক্ষেত্রে) তারা বিপরীত এমনকি প্রানী বা উদ্ভিদের পক্ষে বিপজ্জনক কাজও করতে পারে। বিটি বেগুন বা বিটি তুলোর ক্ষেত্রে ফসল কম জন্মানো, ফসলটা রোগ প্রতিরোধে অতি সক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঐ দিকেই নির্দেশ করে।

অনেক সময় পরক জীন বা জীনগুলি একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যদের জন্য ঠিক একভাবে কাজ করেনা। কোনও কোনও পরিবারিক সদস্যদের জন্য উৎপাদন বাড়ানর পরিবর্তে জীনটি বা জীনগুলি উৎপাদন ব্যাহত করার কাজে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরকজীন সম্পন্ন পরিবারের সদস্য আবার পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে প্রজননে সক্ষম। এখন আকস্মিকভাবে যদি পরক-জীন সম্পন্ন একটি ফসল ঐ পরিবারের অন্য এক প্রজাতির ফসলের সঙ্গে 'অসবর্ণ বিবাহ'-এর কারণে এই ব্যাহত প্রজাতির সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, তবে ঐ পরিবারের বংশ অচিরেই নির্বংশ যাবে। এই বিপদ খুবই বাস্তব। এক জাতের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফুলের পরাগ ঐ পরিবারের অন্য একটি প্রজাতির ফুলকে নিষিক্ত করলে যে ধরনের মধু উৎপন্ন হয়, তা প্রজাপতি এবং অন্যান্য অনেক পোকার পক্ষে বিষবৎ। এই প্রজাপতি বা পোকারাই আবার ঐ সব ফুলে পরাগ-সিঞ্চনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রায় একমাত্র প্রক্রিয়া। এই পোকা/প্রজাপতিরা দলে দলে বিষাক্ত মধু পান করে প্রাণত্যাগ করলে ঐ ফুলের প্রজাতিগুলোও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে পা বাড়াবে। জীন-প্রযুক্তি এই বিষয়ে এমন এক বিপদের জন্ম দিয়েছে, যার মোকাবেলা করার শক্তি প্রকৃতির নেই - জীন-প্রযুক্তির হাতেও কোনও দীর্ঘস্থায়ী, টেকসই সমাধান নেই।

এইবার আসি তৃতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত খাদ্য/ফসলের কথায়। এই তৃতীয় প্রজন্মের ফসলগুলোতে বিজ্ঞানীরা পরক জীন (বা জীনগুচ্ছ) প্রবিষ্ট করে সেই ফসলে/খাদ্যে পুষ্টি, খাদ্যপ্রাণ বা প্রোটিন বা অন্যান্য গুণাবলী যোগ করেন। এই তৃতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত খাদ্যের কথা বলেই জীন-প্রযুক্তির সমর্থকরা জীন-প্রযুক্তির পক্ষে সওয়াল করে থাকেন। ঘটনা হলো এখনও প্রথম প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলই আমরা সঠিকভাবে নির্মান করতে পারিনি। প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জীন-প্রযুক্তির সমর্থক বিজ্ঞানীরাও আমতা আমতা করে বলছেন যে এই বিষয়ে অনেক গবেষণাই এখনও বাকি-সময়ের পরীক্ষায় এই সব হাঁসজারুদের বসার এখনও সময়ই হয়নি। এই পুরো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণ অনুসন্ধান ছাড়াই বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল নির্মানে প্রবৃত্ত হলেন।

দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল বিটি তুলো ভারতে ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর সর্ববৃহৎ গণমৃত্যুর জন্ম দিয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া এত বৃহৎ গণহত্যার পরীক্ষা একমাত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যতন্ত্রের রূপকাররা করতে সমর্থ হয়েছিলো। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর তুলো চাষীরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসলের অ-রূপায়ণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন বলা যায়। এবারও দ্বিতীয় প্রজন্মের এই নেতি-বাচক অভিজ্ঞতায় আমল না দিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের পথে জৈব-প্রযুক্তির ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বিজ্ঞানীদের একাংশ পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমন এক ফসল হলো 'সোনালী চাল' যা কিনা ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ বলে দাবি উঠেছে। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সন্দেহ জনক, অতিরিক্ত রোগপ্রবণ এই চাল-এ সাধারণ চালের চেয়ে ভিটামিন-এ বেশি থাকলেও এতে এমন পরিমাণ ভিটামিন-এ নেই যাতে সাধারণ চাহিদামতো পরিমাণের ভাত খেলে দিনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ

পাওয়া যাবে। হয়ত ১৮ কিগ্রা চাল খেলে তবেই শুধুমাত্র চাল থেকেই সারাদিনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ চাহিদা মিটবে। এই চাল, সাধারণ চালের চেয়ে বহুগুণ দামি। এ যেন বাজারে রুটি কিনে খাওয়ার সামর্থ্যহীন ব্যক্তিকে পার্ক স্ট্রীটের সাহেবি দোকান থেকে কেক কিনে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া।

জীন-প্রযুক্তির অন্য একটি দিক হলো তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিরোধী। যে বৈজ্ঞানিক মুক্ত মনের আলোচনা-মতবিনিময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাণভোমরা, গোপনীয়তা এবং ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনুজ্ঞাধর্মী পদ্ধতিতেই জীন-প্রযুক্তি-জাত ফসল/খাদ্য বাজারে আসছে। সারা দেশের মানুষ, চাষী, বিজ্ঞানীরা বিটি বেগুনের বিরোধী, অথচ তার মাঠস্তরে পরীক্ষা অব্যাহত। যে বিজ্ঞানীরা এই অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তাঁদের গবেষণার সুযোগ ও সুবিধা সংকুচিত হচ্ছে। অতিকায় বহুজাতিক সংস্থা মনসান্টোর পরীক্ষার ফলের বিরোধী মত পোষণ করায় বিজ্ঞানী পুস্তাই চাকরি খুইয়েছেন। জীন-প্রযুক্তির প্রবক্তারা এই প্রবঞ্চনা আর কত দিন চালাবেন?

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	পি-২৫২ লেক টাউন ব্লক-এ কলকাতা ৭০০ ০৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ২৭/১, কালিন্দি হাউসিং এস্টেট কোলকাতা ৭০০ ০৮৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি আর্ট প্রিন্টার্স কলকাতা ৭০০ ০১২

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি

শুভ্র কেতন বসু

2001 সালে ফ্রন্ট লাইন পত্রিকার এক সাক্ষাতকারে ভারতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্ণধার ড. এম এস স্বামীনাথন বলেছিলেন সবুজ বিপ্লবে বহু ভূল হয়েছিল।[1] এই স্বামী নাথনই বর্তমানে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব নিয়ে সওয়াল করছেন। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে অ্যামেরিকান প্রযুক্তির সয়াহতায় জিন পরিবর্তিত শস্য চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ বিপ্লবে কি ভুল হয়েছিল, কারা ভুল করেছিল, ভুলের মাসুলই বা কারা দিয়েছে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা দরকার। দ্বিতীয় সুবজ বিপ্লবে আরও বড় কোন ভুল হতে চলেছে কিনা তাও আলোচনা হওয়া দরকার। ভুলের মাসুলটা শেষ পর্যন্ত আমাদের মত সাধারণ মানুষকেই দিতে হবে কিনা সেটাও আমাদের বুঝে নিতে হবে।

সবুজ বিপ্লবের ভুল ঃ ভারতে সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ষাটের দশকে। বিদেশী বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক আর জলের প্রচুর ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার কর্মসূচী নেওয়া হয়। সবুজ বিপ্লবের জনক ছিলেন নরম্যান বোরল্যাগ। এই কৃষি বিজ্ঞানী নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিলেন। সেই ষাটের দশকে তিনি ভারতীয় কর্মকর্তাদের বলে ছিলেন "যদি আমি তোমাদের পার্লামেন্টের সদস্য হতাম তাহলে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর আমার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতাম আর চিৎকার করে বলতাম সার দাও ..... চাষীদের আরও সার দাও"।[2] বলা বাহুল্য এই সার রাসায়নিক সার। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে ভারতের মোট কৃষিজমির দুইতৃতীয়াংশ অত্যধিক কৃষি রাসায়নিক ব্যবহার করার কারণে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত।[3] এদেশের বিস্তীর্ন অঞ্চলে মাটির তলার জলের স্তর এতো নেমে গেছে যে শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনও তার নাগাল পাচ্ছেনা। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পড়েছে প্রাণঘাতি বিষ যা মানব শরীরে দূরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দিয়ে চলেছে। মাত্র দু একটি তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করার ফলে হাজার হাজার বহু আশ্চর্য গুণ সম্পন্ন দেশীয় জাত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রায় ৩৫ প্রজাতির প্রাণী ফসলের ক্ষতিকর পেষ্ট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যাদের আগে কোনো অনিষ্টকারি ভূমিকাই ছিল না।[4]

দেশে যখন সবুজ বিপ্লবের তোড়জোর চলছে তখন কটকের Central Rice Research Institute এর ডিরেক্টর ছিলেন ড. আর এইচ রিচারিয়া। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের রোগ ও পোকার প্রতি কি পরিমাণ সংবেদনশীল তা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে এই উচ্চফলনশীল জাতগুলিকে অবাধে ভারতে চাষ করা উচিৎ নয়। এই অপরাধে তার চাকরি যায়।[5] পরবর্তিকালে তিনি Madhya Pradesh Rice Research Institute এ একজন Junior scientist হিসাবে যোগদান করেন। ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের কৃষি পদ্ধতির উপর গবেষণা করে তিনি প্রমাণ করে ছিলেন যে ভারতে এমন বহু ধানের জাত রয়েছে যা বিনা রাসায়নিকেই তথাকথিত উচ্চফলনশীল জাত IR 8 এর সমান ফলন দিতে পারে।[6] এরপর বিশ্বব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যায়। যদি রিচারিয়ার গবেষণা সরকারি আনুকুল্য পেত এবং সেই মত কৃষিনীতি প্রণয়ন করা হত তাহলেও খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যেত কিন্তু পরিবেশের এই ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হত। এটা খুবই রহস্যময় যে, সবুজ বিপ্লব যে ভূল প্রযুক্তি সেকথা ড. রিচারিয়া প্রায় তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেও ড. স্বামীনাথন প্রায় চার দশক সময় নিলেন!

অবশ্য সবুজ বিপ্লবের এই ভুলটা না হলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার সার, বিষ বীজ আর কৃষি যন্ত্রপাতি বেচতে পারতো না।

কর্পোরেট পোপ আর গ্যালেলিও ঃ সবুজ বিপ্লবের ভুল শোধরাতে এখন দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের তোড়জোর চলছে। জিন পরিবর্তিত শস্য চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে জিন পরিবর্তিত শস্য কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমাবে। জিন পরিবর্তিত শস্যে এমন গুণ থাকবে যা অপুষ্টি দুর করতে বিশেষ কার্যকর হবে। এই দাবীগুলিকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। জিন পরিবর্তিত শস্য মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কি প্রভাব ফেলে তারও আলোচনা দরকার। কিন্তু তার আগে একটা ঘটনার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। 1998 সালে ড. আর্পাড পুশতাই জিন প্রযুক্তিজাত আলুর ইঁদুরের ওপর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখেন যে জিন পরিবর্তিত আলু ইঁদুরকে খাওয়ালে তাদের পাকস্থলির আবরণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, রোগ প্রতিরোধশক্তি কমে যাচ্ছে এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। তাই এই ধরণের আলু মানুষের পক্ষেও ক্ষতিকর। তিনি তার এই পর্যবেক্ষনের কথা স্থানীয় একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বলেন। ড. পুশতাই ছিলেন স্কটল্যান্ডের Rowett Research Institute এর প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ওই টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি করার অপরাধে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তার গবেষণা পদ্ধতিতে ভুল ছিল। তার গবেষণা থেকে কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্ত হবার আগেই তিনি গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। তাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয় এমনকি পাগল প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা হয়।[7] ড. পুশতাই অতঃ পর তার গবেষণা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের 24 জন বিজ্ঞানীর কাছে পাঠান। ওই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে ড. পুশতাই এর গবেষণায় কোনো ভুল নেই। ড. পুশতাই এর গবেষণাপত্র অতঃপর বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা Lancet এ 1999 সালে প্রকাশিত হয়।[8]

এই ঘটনার ফলে একটি হিমশৈলের চূড়া ভেসে ওঠে। যেহেতু বহুজাতিক সংস্থাগুলি জিন প্রযুক্তির গবেষণায় কোটি কোটি টাকা ঢালছে তাই জিন পরিবর্তিত শস্যের বিরুদ্ধে কোনো ট্যাঁ ফ্যোঁ করা যাবে না। সে তুমি যতবড় বিজ্ঞানীই হওনা কেন। Rowett Institute এর প্রসঙ্গে বিখ্যাত পত্রিকা The Ecologist -এ একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল। কার্টুন এ দুটি ছবি, একটিতে দেখা যাচ্ছে পোপ গ্যালিলিওকে বলছেন যদি তুমি চার্চের কথা না মানো তাহলে তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো। পাশের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে এক কর্পোরেট বস ড. পুশতাইকে বলছেন যদি তুমি কর্পোরেটের নির্দেশ না মানো তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করবো। সর্বসমক্ষে তোমাকে হাস্যাস্পদ করবো আর মামলা করে তোমাকে সর্বশান্ত করে দেবো। কার্টুনটির শিরোনাম ছিল Evolution of Science- বিজ্ঞানের বিবর্তন।

জিন পরিবর্তিত শস্য ঃ-দাবী এবং বাস্তব —

যে জিন পরিবর্তিত শস্যটি নিয়ে ভারতে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার নাম বিটি তুলো। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস নামে একে ব্যাকটেরিয়ার জিন এই তুলো গাছের কোষে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। এই জিনগুলি কিছু বিষাক্ত প্রোটিন যেমন Cry I Ab, Cry I Ac ইত্যাদি উৎপন্ন করে। এই জিন পরিবর্তিত তুলোগাছের প্রতিটি কোষেই ঐ বিষাক্ত প্রোটিনগুলি উৎপন্ন হয়, ফলে কোনো পোকা ওই তুলো গাছের কোনো অংশ খেলেই মারা পড়ে। এই তুলোগাছকে তাই সর্বপতঙ্গ প্রতিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং দাবী করা হয়েছিল যে এই তুলোগাছ চাষ করলে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমবে। কিন্তু এই দাবীর সাথে বাস্তব মিলল না। বিটি তুলোর ক্ষেত রোগ এবং পোকার আক্রমণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্যের চাষীরা যারা বহুদাম দিয়ে মনস্যান্টো কোম্পানীর কাছ থেকে বিটি তুলোর বীজ ও প্রযুক্তি কিনেছিল তারা সর্বশান্ত হয়ে যায়। ওদের অনেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন 2003 সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রি ষ্টার টিভি কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে তার রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার প্রধান কারণ বিটি তুলোর ব্যর্থতা।[৯]

অথচ বর্তমানে বিটি বেগুন বিটি ট্যাড়স বিটি ধান ইত্যাদি নানান জিন পরিবর্তিত ফসল আমাদের দেশে চালানোর চেষ্টা চলছে। এগুলির সপক্ষেও প্রধান যুক্তি এগুলি পতঙ্গ প্রতিরোধী তাই কীটনাশকের ব্যবহার কমাবে, ফলন বাড়াবে।

বিটি তুলোর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল এই ''পতঙ্গ প্রতিরোধী'' তুলো তুলোগাছের সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা পিঙ্ক বোলওয়ার্ম প্রতিরোধ করতে পারছে না। এর কারণ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীরা দ্বিবিধ সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এমন হতে পারে যে পিঙ্ক বোলওয়ার্মের তীব্রতম আক্রমণের সময়, এবং কোষের অভ্যন্তরে বিটি বিষের সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় এক নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে পিঙ্ক বোলওয়ার্মের কোনো কোনো জাত জিন মিউটেশনের ফলে বিটি বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। বিজ্ঞানী Morin (2003) এর গবেষণা থেকে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনার সপক্ষে জোরদার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[১০] বিটি তুলো তাই কীটনাশকের ব্যবহার আদৌ বন্ধ করতে পারেনি। যেখানে বিটি তুলোর চাষ হয় সেখানে যথেষ্টই কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। বিজ্ঞানী বি. ই টাবাশনিকের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পিঙ্ক বোলওয়ার্ম কয়েক প্রজন্মর মধ্যেই বিটি বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে। তার গবেষণাগারে তিনি এমন পিঙ্ক বোলওয়ার্ম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যা বিটি বিষ Cry 2 Ab এর বিরুদ্ধে 240 গুণ এবং একই সাথে অন্য একটি বিটি বিষ Cry I Ac এর বিরুদ্ধে 420 গুণ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে।[১১] জিন প্রযুক্তি আর যাই করতে পারুক পতঙ্গের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। যে ভাবে কোনো পতঙ্গ আর পাঁচটা বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে সেই ভাবেই বিটি বিষের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এই সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যটা স্বীকার করে নিলে বিটি শস্যের মাধ্যমে পতঙ্গ প্রতিরোধ করার দাবীর অসারত্ব বুঝতে অসুবিধা হয়না।

বিটি শস্য চাষ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বহুবিধ। বিটি শস্যের মুল থেকে নির্গত বিষাক্ত নির্যাস মাটির বহু উপকারি অনুজীবকে নষ্ট করে দেয় যার ফলে উর্বরতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১২] বিটি শস্যের পরাগ খেয়ে অন্যান্য অক্ষতিকারক পোকা যেমন প্রজাপতি মারা পড়ে[১৩]। যা বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিটি ফসলের দেহাবশেষ পচনের ফলে প্রকৃতিতে বিটি বিষ মুক্ত হয়। বিজ্ঞানী রোজি মার্শালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এই ভাবে বিটি বিষ মুক্ত হয়ে ঝরনার জলে মিশলে বহু জীবের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পরছে এবং বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হচ্ছে।[১৪] বিটি শস্য প্রকৃতির উপর কোনো বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলবেনা এই দাবী ক্রমশই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হচ্ছে।

বিটি শস্যবীজ উৎপাদক কোম্পানীগুলির পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে বিটি বিষ মানুষের শরীরে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবেনা কারণ মানুষ বিটি শস্য খেলে বিষাক্ত বিটি প্রোটিন মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্রে হজম হয়ে যাবে, ফলে রক্তে মেশবার সুযোগ পাবেনা। কিন্তু দেখাগেল যে এই দাবী অদৌ বৈজ্ঞানিক নয়, নিছকই বাণিজ্যিক। কানাডার বিটি শস্যের বহুল প্রচলন রয়েছে। সম্প্রতি সেদেশের Sherbrooke বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি সমীক্ষায় 93% মা ও 80% ভ্রুণের রক্তে Cry I Ab জাতীয় বিটি বিষের সন্ধান পেয়েছেন।[১৫] রক্তে এই বিষের উপস্থিতি অ্যালার্জী গর্ভপাত এমন কি ক্যানসারও ঘটাতে পারে।

গোল্ডেন রাইস ঃ চকচক করলেই সোনা হয়না —

জিন প্রযুক্তির সাহায্যে এমন ধান বানানো গেছে

যার চালে ভিটামিন A উৎপাদক বিটা ক্যারোটিন থাকবে। এই জাতীয় ধান প্রথম আবিষ্কার করেন Ingo Potrykus নামে এক বিজ্ঞানী। আবিষ্কারের সাথে সাথে বহুজাতিক কোম্পানি মনস্যান্টো এটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এই ধানের নাম দেওয়া হয় গোল্ডেন রাইস। বলা হয় যে তৃতীয় বিশ্বের গরীব শিশুদের Vitamin -A এর অভাব জনিত অপুষ্টি তাড়াবার জন্য এক মোক্ষম দাওয়াই হল গোল্ডেন রাইস। বাজারী পত্রিকার পন্ডিতন্মন্যরা স্কুলের মিডডে মিলে গোল্ডেন রাইস খাওয়ালে কি সুফল হবে তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখে ফেলল। অথচ প্রথমদিকে গোল্ডেন রাইসের চালে এত সামান্য পরিমাণ বিটা ক্যারোটিন থাকতো যে তা দিয়ে Vitamin -A চাহিদা মেটাতে হলে দৈনিক মাথাপিছু 9 কেজি ভাত খাওয়াতে হবে।[16] অতি উচ্চ গণিতে শিক্ষিত কিছু বিজ্ঞানী এই সাধারণ পাটিগণিতটা না বুঝেই গোল্ডেন রাইসের পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন কেন তা সত্যিই রহস্যময়। যেমন রহস্যময় ডা. স্বামীনাথনের সবুজ বিপ্লবের ভুল বুঝতে না পারা। পরবর্তী কালে আরও নিবিড় গবেষণায় গোল্ডেন রাইসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ উল্লেখ যোগ্য মাত্রায় বাড়ানো গেছে কিন্তু গোল্ডেন রাইসের বাণিজ্যিকীকরণ তারজন্য অপেক্ষা করে থাকতে চায়নি। বর্তমানে গোল্ডেন রাইসে যে পরিমাণ বিটা ক্যারোটিন থাকে তা সন্তোষ জনক। কিন্তু তারপরেও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রথমত পুঁইশাক, কুমড়ো, বাঁধাকপির মত কিছু অত্যন্ত সস্তার সব্জিতে সর্বাধুনিক গোল্ডেন রাইসের থেকেও অন্তত 200 গুণ বেশি বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায় এগুলি চাষ করাও অত্যন্ত সহজ। তাহলে বিপুল অর্থব্যায়ে গোল্ডেন রাইস গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? দ্বিতীয়ত Vitamin -A অথবা বিটা ক্যারোটিন স্নেহ দ্রাব্য তাই যতই বিটা ক্যারোটিন খাওয়া হোকনা কেন খাদ্যে তেল ইত্যাদি না থাকলে তা শরীরে ঢুকবে না। দেশের অনেক মানুষ যে Vitamin -A এর অভাবে ভোগে তার কারণ খাদ্যে বিটা ক্যারোটিন নয় বরং তেলের অপ্রতুলতা। তেলের দাম যখন আকাশ ছোঁয়া তখনন বিটা ক্যারোটিন গোল্ডেন রাইসেই থাকুক আর কুমড়োতেই থাকুক, রাতকানা রোগ কমবে না। আমি একবার এক জিন প্রযুক্তিবিদকে (যিনি গোল্ডেন রাইস নিয়েই গবেষণা করছেন) বলেছিলাম কুমড়ো আর পুঁইশাক থেকেই যখন যথেষ্ট বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়, তখন গোল্ডেন রাইস নিয়ে এই গবেষণার দরকার কি? তিনি উত্তরে বলেন ঘাসেও প্রচুর ভিটামিন আছে, তাহলে মানুষ কি ঘাস খেয়ে থাকবে? এরকম মারাত্মক বৈজ্ঞানিক যুক্তি শুনে আমার মত অবৈজ্ঞানিকের মুখে আর কথা সরেনি।

বিজ্ঞানীরা কি জুয়াই খেলতে চান? পৃথিবীর বুকে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাস ঃ কোনো একটা বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক খুবই জটিল। এই আন্ত সম্পর্কের সবটা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কোনো বাস্তুতন্ত্রে কোনো জিন-পরিবর্তিত জীবকে ঢোকালে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রে কি পরিবর্তন ঘটবে বহুদিন ধরে সংরক্ষিত স্থানে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা অসম্ভব। বিজ্ঞান এক জীবের জিন অন্য জীবে প্রতিস্থাপনের কৌশল আয়ত্ব করলেও জীব কোষের অভ্যন্তরে জিনের কার্যাবলী ঠিক কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা সম্যক জেনে উঠতে পারেনি। RNA Editing বা micro RNA সংক্রান্ত গবেষণা দেখিয়ে দিচ্ছে যে জিনের কার্য্যাবলী এখনও অনেকটাই রহস্যাবৃত। কোনো কোনো গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রক DNA বা RNA নয়। ক্রোমোসোম গঠনকারী প্রোটিনগুলির এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই জাতীয় উত্তরাধিকারকে বলা হয় Epigenetic Inheritance যার কৌশল প্রায় সবটাই অজানা। এমতাবস্থায় কোন জিন পরিবর্তিত শস্যকে চাষ করলে বা প্রকৃতিতে নিয়ে আসলে তার ফল কি হবে তা ঘোর অনিশ্চিত। যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি জিন প্রযুক্তির গবেষণায় কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে তারা কোনো ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে জিন পরিবর্তিত শস্যকে বাজারে আনতে চাইছে। জিন পরিবর্তিত শস্যের ফলাফল কি

হবে তা দেখার জন্য তারা দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা নিরীক্ষায় উৎসাহী নয়। একদম জুয়া খেলার মানসিকতা নিয়ে তারা চাইছে চট জলদী মুনাফা তাতে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য জাহান্নামে যায় তো যাক। জিন প্রযুক্তিবিদ বিজ্ঞানীরাও অনেকেই এই জুয়ার নেশায় মেতে উঠেছেন। তবে এ এমন এক জুয়া যেখানে জিতলে কোম্পানীর মুনাফা, হারলে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।

অথচ ভারতের মত জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটা দেশে বিভিন্ন ফসলের যে অত্যাশ্চর্য গুণ সম্পন্ন বহু ভ্যারাইটি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মূলধারার বিজ্ঞানীদের ঔদাসীন্য মর্মান্তিক। ভারতে প্রায় 7000 অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে 3700 টি খাদ্য হিসাবে, 525 টি তন্তু উৎপাদনে, 400 টি পশুখাদ্য হিসাবে, 300 টি আঠা ও রঞ্জক প্রস্তুত করতে, 100 টি সুগন্ধি হিসাবে ও বাকী প্রজাতি সমূহ ঔষধ বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।[17] ওই প্রত্যেকটি উদ্ভিদ প্রজাতির অসংখ্য ভ্যারাইটি বিদ্যমান। যেমন সবুজ বিপ্লব আসার আগে কেবল ধানেরই প্রায় 82000 ভ্যারাইটি ছিল। সাম্প্রতিক কালে ড. দেবল দেব পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 700 দেশীয় জাতের ধানের উপর গবেষণা করে চকমপ্রদ তথ্য পেয়েছেন। দেখা গেছে দেশী ধানের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে এখনও কোনো তথাকথিত উচ্চফলনশীল ধানে আরোপ করা যায়নি। এই দেশী জাত গুলির মধ্যে খরা সহনশীল, বন্যা সহনশীল, উচ্চফলনশীল, অতীব সুগন্ধি ধান রয়েছে। এমন ধান আছে যার একটি ধানে দুটি চাল হয়।[18] বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজলবণ সমৃদ্ধ ধান রয়েছে। বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি গোল্ডেন রাইস নিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে অথচ এই বহুবিচিত্র রকমের দেশীয় ধানের কোনটিতে কত ভিটামিন বা খনিজ আছে তা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়না।

জিন প্রযুক্তির জুয়া না খেলে দেশীয় জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করলেই আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করবো। পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করেই।

নির্দেশিকা ঃ

1. Swaminathan MS. The Balance sheet - optimism (interview) Frontline 02/02/2001.
2. Shiva Vandana : The violence of the Green Revolution, Other India Press / RFSTE Goa 1992.
3. Eleventh Five year plan 2007-2012, Vol - III PP-8 Planning Commission, GOI
4. Bera PK : Change in the Pest Scenario after HYV Introducton in West Bengal. Proceedings of the Work shop on conservation and community copyrights of Folk Crop variety WWF-India, Eastern Region, 1996.
5. Alvares Caude : The Great Gene Robbery : Illustrated Weekly of India : 23-29 March 1986
6. Dugra B : The Ecologist 13:84 (1983)
7. www.psrast.org/pusztai.htm
8. ঐ 7
9. Deb Debal, Industrial Vs Ecological Agriculture, Navdanya, RFSTE New Delhi, 2004.
10. www.genecampaign.org / publication
11. www.pnas.org /../ 0901351106.short.
12. Walliman, Bt toxin : assessing G M strategies : Science 287:41, 2000
13. ঐ 9
14. Marshall Rosi, PNAS October 9, 2007 vol 104 N.41, pnas 0707177104.
15. Aziz A & Leblanc S. Reproductive Toxicology 18 February, 2011 [www.sotl.net / articles / show/227104-B ....]
16. ঐ 9
17. Arora P. K. (coordinator, IPGRI office for South Asia) : Ethnobotary : Role in the conservation and use of Plant genetic resources in India : Ethno Botany Vol. 9, PP-6-15.
18. Deb Debal : Seeds of Tradition Seeds of Future, Folk Rice Varieties of Eastern India R F S T E, New Delhi, 2005

ফসলের জাত উদ্ভাবনে প্রথাগত প্রজনন, আসিসট্রেড ব্রিডিং ও জিন পরিবর্তিত শস্য

অনুপম পাল
anupampaul99@gmail.com

সভ্যতার উন্মেষ ও কৃষি প্রগতি ঃ মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে বন্য ফসলের থেকে খাদ্য ফসল ও গৃহপালিত প্রাণী বাছাই ও জাত নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমরা আজকের খাদ্য ও গৃহপালিত পশুর যে তালিকা পাই তা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের ফল। সিন্ধুসভ্যতার পর পাঁচ হাজার বছর ধরলে আমাদের খাদ্য তালিকায় নতুন কোন ফসল সংযুক্ত হয়নি। অথচ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অবশ্য সেই যুগে টমাটো, আলুর চল ছিল না, এই সব ফসল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ধানের একটি প্রজাতি (ওরাইজা সাটিভা) থেকে পৃথিবীতে অঞ্চল ভেদে হাজার হাজার ধানের জাত তৈরী হয়েছে - ধানের জাত নির্বাচিত হয়েছে। বাসমতি ধানের ইতিহাস হাজার বছরের পুরণো। কথিত আছে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবকে সুজাতা যে চালের পায়েস দিয়েছিলেন সেই চালের নাম কালানমক। এই সুগন্ধি ধানের চাষ হিমালয়ের পাদদেশে আজও হয়। অনেকে বলেন উত্তর বঙ্গের কালোনুনিয়া চালের সঙ্গে এর মিল আছে। ভারতে ৮২০০০ দেশজ ধানের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে, ন্যাশনল ব্যুরো অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সের (২০০৭-০৮) রিপোর্টে। এই নির্বাচন কাজের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা কেউই জিন, প্রোটিন, পরিসংখ্যান বিদ্যা এসব কিছুই জানতেন না। আমরা এখনো তাঁদের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে ভুলে যাই। শুধু ধান নয়, অন্যান্য ফসল ও প্রাণীরও জাত নির্বাচিত হয়েছে এই ভাবে। বেগুনের ৩৬৬৮, ধানের ৩৮৫ জাত, দেশী গরুর ১৩ রকমের জাত নির্বাচিত হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। প্রখ্যাত প্রজননবিদ ডবঝানস্কি বলেছিলেন - *জীববিদ্যায় কোনকিছুই অর্থবহ হয়না যদি তা বিবর্তনবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা না যায়।*

১৯৯৯ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া ব্লকের বাজিতপুর গ্রামের কৃষক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বাছাড় গোবিন্দভোগ ধানের মধ্যে অন্য রকম ধান দেখতে পান যাকে আজোয়া বা নামধান বলে। সেই ধানের শীষ সংগ্রহ করে পরের বছর আলাদা করে জমিতে লাইন করে কয়েক লাইন লাগান। বেশ গয়েকবছর করবার পর সেই ধানটির চরিত্র আপাত সুস্থির অবস্থায় আসে। ধানটির ফলন ভালো, সরু গন্ধবিহীন, প্রায় ২ফুট জলেও হবে, ১০-১২ দিন জলে ডুবে থাকলেও পচে না। বিগত ১০ বছরে লালকামিনী নামক ধানটির প্রচলন হয়েছে ওই অঞ্চলে। শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়ার উমাপুর গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক শ্রীপ্রভাত দে খেজুরছড়ি নামক গুচ্ছ ধানের মধ্যে প্রায় ৫০ রকমের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেন এবং তিনি পরের বছরে ধানগুলির চাষ করেন আলাদা ভাবে। এই ভাবেই নতুন জাতের উদ্ভাবন হয়। ইদানীং কৃষকের এই উদ্ভাবনী শক্তিকে আর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আধুনিক জাতের সংখ্যা কৃষকদের নির্বাচিত ফসলের জাতের সংখ্যা থেকে বেশী নয়।

ধান স্বপরাগযোগী উদ্ভিদ, ক্রমাগত ভাবে চাষ করবার ফলে, স্বপরাগযোগের মাধ্যমে বিশুদ্ধ লাইন তৈরী হয়। বংশগতির ভাষায় একে পিওরলাইন বলে। এখানে বাইরের অন্য কোন জাতের পরাগমিলন ঘটছে না অন্য কোন চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটল না। এর আর এক নাম হোমোজাইগাস। ইতরপরাগযোগী ফসলে (যেমন বেগুন) কৃত্রিমভাবে স্বপরাগযোগ ঘটিয়ে পিওরলাইন (ইনব্রেড) তৈরী করা হয় এবং তা সরাসরি কোন জাত হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। এক দেশের ফসল বা ফসলের জাত পরিবেশ ও অঞ্চল ভেদে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই ফসল/জাতগুলি অন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবেদা, পেয়ারা। আবার ঝিঙেশাল, রুসশাল, ঘিয়স, গোবিন্দভোগ ইত্যাদি ধান দুই বাংলায় চাষ হয়। লবণ সহনশীল ধান যেমন- লালগেতু সাদাগেতু, তালমুগুর, নোনাবোখরা ইত্যাদি জাতকে দীর্ঘদিন ধরে লবনবিহীন জমিতে চাষ করলে এর লবনসহনশীলতা কমে যাবে। উল্টোটাও হতে পারে। একে বলা হয় শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন। এই বিষয়গুলি ইদানিং অবহেলিত।

আধুনিক উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার প্রযোগ ঃ ১৯০০ সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের বংশগতি নিয়ে গবেষণা পুনরুদ্ধার করবার পর থেকে প্রজনন বিদ্যায় প্রভূত অগ্রগতি হয়। ১৮৬৬ সালে মটর গাছ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা এবং এর সুত্রগুলো সমাদৃত হয়নি। মৃত্যুর পর তিনি বংশগতির জনক হিসাবে পরিচিত হলেন। সংকরায়নের জন্য সাধারণত দুটি একই প্রজাতির বিশেষগুণ সম্পন্ন (যেমন বেশী ফলন দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন

ও ঝলসা প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন ধানে) জাত দুটিকে স্বপরাগযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে বিশুদ্ধ লাইন তৈরীর পর কৃত্রিম ভাবে কয়েক হাজার পরাগ মিলন করানো হয়। এক জাতের ফুলের গর্ভমুন্ডে অন্য জাতের ফুলের পরাগ দিয়ে মিলন ঘটানো হয়। এর থেকে উদ্ভূত বীজ নিয়ে পুনরায় চাষ করে পরীক্ষা করা হয় - ফলন বেড়েছে কিনা এবং কৃত্রিম ভাবে ঝলসার সংক্রমণ ঘটিয়ে ঝলসা প্রতিরোধ করতে পারে কিনা দেখা হয়। মিলনের ফলে বিশেষ গুণ ছাড়াও অবাঞ্ছিত গুণ প্রবেশ করতে পারে। তাই নতুন জাত তৈরীর পর ক্রমাগত পিতা/মাতার সঙ্গে ক্রশ করা হয় যাতে অবাঞ্ছিত গুণগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। একে বলা হয় ব্যাক ক্রশ। এই ভাবে একটি জাত উদ্ভাবন করতে কমপক্ষে ৭-৮ বছর সময় লাগবে। তবে ওই গুণগুলি অনেক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মিলন ঘটালেই যে চাহিদামত চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটবে এমনটা নয়। যদি একক জিন দ্বারা কোন চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে মেন্ডেলের একটি বিশুদ্ধ লম্বা গাছ (TT) এর সঙ্গে বিশুদ্ধ বেঁটে (tt) গাছের নিষেক ক্রিয়ার ফলে প্রথম জনুতে সংকর (Tt) লম্বা গাছ হয়, দ্বিতীয় জনুতে বিশুদ্ধ লম্বা বিশুদ্ধ বেঁটে, ও সংকর লম্বা ১ঃ১ঃ২ অনুপাতে তৈরী হয়। দুজোড়া লক্ষণ নিয়ে সংকরায়ণকে দ্বিলক্ষণ সংকরায়ণ বলা হয়। দুক্ষেত্রেই প্রকট চরিত্রের প্রকাশ ঘটবে এবং প্রচ্ছন্ন চরিত্র চাপা পড়লেও পরের প্রজন্মে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জীবের কোন বিশেষ চরিত্রের জন্য জোড়া জিনকে আলিল বলে। গাছের উচ্চতার জন্য দায়ী জোড়া জিন (TT, Tt, tt) অলিলের উদাহরণ। T এবং t,t এবং t, Tএবং T একে অপরের আলিল।

সংকরায়ণের দ্বারা ইন্ডিকা ধানের সঙ্গে জ্যাপোনিকা ধানের মিলন ঘটিয়ে উচ্চফলনশীল ধান তৈরী করা হয়েছে যা রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগে উপযুক্ত জমিতে উচ্চফলন দেয়; সব পরিবেশে নয়। এর বীজ তিন বছর অন্তর পাল্টাতে হয়। এই জাত গুলোর পিতা ও মাতার চরিত্র কম বেশী তিনটি প্রজন্মের পর প্রকাশ পায় (সেগ্রিগেশান), ফলন কম হয়, বিভিন্ন ধরনের ধান জমিতে দেখা যায়। বহুল পরিচিত মিনিকিট ধান (শতাব্দী বা আই ই টি ৪৭৮৬) তিনটি প্রজন্মের পর চতুর্থ প্রজন্মের লাগানো ধান ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় কান্ড যুক্ত ধান, বিভিন্ন সময়ে ফুল আসা ইত্যাদি দেখা যায়। ওই ধানের আসল বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। আবার আই আর ৩৬, পঙ্কজ, মাসুরি, ইত্যাদি ধানে এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন দেখা যায় না। দেশী ধানের চরিত্র স্থিরকৃত হয়েছে হাজার বছর ধরে এবং চরিত্র সহজে পাল্টায় না। যেমন বাসমতি, কালানমক। পালটালেও সেই চরিত্র চোখে পড়ার মত নয়, পরিবর্তন শুধু জিন স্তরে না হয়ে পরিবেশগত কারণের জন্য হতে পারে। এঁটেল মাটিতে ফলানো একটি ধান বেলে মাটিতে করলে সামান্য মোটা হতে পারে।

১৯৪৯ সালে তাইওয়ানে বেঁটে ধান ডি জিও উজেন এর সঙ্গে ওখানকার রোগপ্রতিরোধক লম্বা ধান সাই ওয়ান চু এর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে যে ধান হয়েছিল সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে নির্বাচিত ধান হল টি এন ওয়ান (তাইচুং নেটিভ ওয়ান)। এটি ছিল বেঁটে জাতের, বেশী পাশকাঠি যুক্ত এবং রোগ পোকা সহনশীল। কিন্তু এর রোগ পোকা সহনশীলতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেল। ভারতে জয়া, পদ্মা, তেলেহামসা (অন্ধ্রপ্রদেশ) ইত্যাদি ধানের পিতা মাতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৬৪ সালে। ১৯৬২তে আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে তিন রকম ধানের মধ্যে মিলন ঘটানো হয় (এক সঙ্গে নয়)। অষ্টম ক্রমশ হয় পোটাধান ও ডি জিও উজেন এর সঙ্গে। এর থেকে নির্বাচিত হওয়া ধান হল আই আর ৮, আই আর ২০, আই আর ২৬ ইত্যাদি। ১৯৬৭ সালে বাজারে আসে। এ পর্যন্ত ভারতে প্রায় ৬০০ কাছাকাছি আধুনিক জাতের ধান উদ্ভব হলেও প্রতিটি রাজ্যে ১০টির বেশী ধান চাষ হয় না। পশ্চিমবঙ্গে এমটিইউ ৭০২৯ (লাল স্বর্ণ), আই ই টি ৪৭৮৬ (শতাব্দী/মিনিকিট), আই ই টি ৫৬৫৬ (স্বর্ণধান), এম শংকর, গীতাঞ্জলী, সি আর ১০১০, ১০০৯, ১০১৭ ইত্যাদি। ১৯৬৬ সালে বেঁটে জাতের বেশী ফলনের গম লারমা রোজো ৬৪-এ, সোনেরা ৬৪ ইত্যাদি মেক্সিকো থেকে এদেশে আমদানী করে ভারতে চাষ শুরু হয়। এই গমের জাত, রাসায়নিক সার বিষ ও প্রভুত সেচের ফলে সবুজ বিপ্লব ঘটেছিল। এর ফলে দ্রুত ফলন বেড়েছিল। এই সবুজ বিপ্লব প্রশ্নাতীত নয়। এই ফসলের চাষের জন্য প্রভুত খরচ হয়, সার বিষ প্রয়োগ না হলে দেশী জাতের থেকে ফলন কম, তাই একে উচ্চ ফলনশীল না বলে আধুনিক জাতের ধান বলা ভালো এবং এই জাত গুলি বিশেষত ধানের জাত গুলি প্রান্তিক জমি যেমন উঁচু, জলমগ্ন ও নোনা জমির উপযুক্ত নয়। এই চাষের ফলে ধানের জমিতে সহজলভ্য প্রোটিনের উৎস মাছ, গেড়ি-গুগলি আর জন্মায় না। আবার অনেক

দেশী ধানের ফলন শুধু মাত্র গোবর সার দিয়ে আধুনিক জাতের মত। কটকের কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. আর এইচ রিচারিয়া বহিরাগত ধানের জাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং দেশী উন্নত জাত তৈরী ও নির্বাচন নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক ধানের জাত নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এগুলোর জন্য সার ও বিষের কোন প্রয়োজন হত না। বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে তাঁর গবেষণা বন্ধ হয় এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। আজ পর্যন্ত সেই ধান গুলোর মূল্যায়ন হয়নি। ১৩০০০ দেশী ধানের বীজ রায়পুরে ইন্দিরা গান্ধী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্গে রাখা আছে। পরিতাপের বিষয় দেশজ ধানের মূল্যায়ন, দেশ ও কৃষকের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ নিয়ে কোন চর্চাই হয় না।

আসলে চাষীর হাত থেকে বীজের অধিকার কেড়ে নেওয়া সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির অঙ্গ। বীজকে আর পাঁচটা জিনিষের মত বাজারী পণ্য করে তার সঙ্গে সার বিষ ও জল তোলা পাম্পের ব্যাপক বিক্রির ব্যবস্থা। আমাদের ফসল সম্পদের কোন মূল্যায়ন না করেই বাইরের প্রযুক্তি আমদানি করা হয়েছে।

হাইব্রিড বা সংকর জাত ঃ সংকরায়নের ফলে প্রথম জনুতে (প্রজন্ম) সব জীবেই/উদ্ভিদে পিতামাতার গুণাবলি প্রবেশ করবেই এমনটা নয়। কিন্তু কিছু জীবের /উদ্ভিদের বৃদ্ধি পিতা এবং মাতার থেকে বেশী পরিলক্ষিত হয়। যেমন বেশী ফলন, বেশী রোগ সহনশীলতা ইত্যাদি। একে বলা হয় হেটেরোসিস বা হাইব্রিড ভিগর এবং এই প্রথম অপত্য জনুকে (F1) হাইব্রিড বলে। পরের প্রজন্মে হাইব্রিড ভিগর কমে যায় তাই ফলনও কমে, ফলন নাও হতে পারে। প্রত্যেক বছর বীজ কোম্পানীরা আগে থেকে সংকরায়ন করে হাইব্রিড তৈরী করে থাকেন। প্রত্যেক বছর কৃষককে বেশী দাম দিয়ে এই বীজ কিনতে হয়, বিষ সারও বেশী লাগে। এই পদ্ধতিতে ভূট্টা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমাটো, লাউ, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ধান ইত্যাদির হাইব্রিড জাত তৈরী হয়েছে। অবশ্য বড় আকারের সবজি/প্রাণী মানেই হাইব্রিড নয়। যেমন আফ্রিকান মাগুরকে হাইব্রিড বলে চালানো হয়। সাধারণত দানা শস্যের হাইব্রিড তৈরীর জন্য ইদানিং সাইটোপ্লাজমিক মেল স্টেরাইল লাইন (এম এস এল), মেইনটেনার লাইন ব্যবহার করা হয়। মেলস্টেরাইল এর অর্থ ওই উদ্ভিদের পরাগ বন্ধ্যা, স্বপরাগযোগ হলেও পরাগ মিলন ব্যর্থ হবে এবং সংকরায়নের জন্য পরাগ আলাদা করে তুলে (এমাসকুলাশন) ফেলার প্রয়োজন হয় না। সবজির ক্ষেত্রে হাতেই পরাগধানী আলাদা (ইমাসকুলেসান) করা হয়।

আমেরিকার টেক্সাসে পাওয়া এক ভুট্টার জাতে আবিস্কৃত হয় টেক্সাস মেল স্টেরাইল সাইটোপ্লাসম বা টি সাইটোপ্লাসম। শুরু থেকে ভুট্টাতেই সবথেকে বেশী হাইব্রিড হয়েছে এবং তখন এই টি সাইটোপ্লাজম ৭০% হাইব্রিড জাতে পাওয়া যেত। এর দ্বারা কম সময়ে হাইব্রিড করা যায়। ১৯৭১-৭২ সালে গোটা আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝলসা রোগে (হেলমিন্থোস্পোরিয়াম মেডিস) ভুট্টার মড়ক লাগে। পরে জানা গেল টি সাইটোপ্লাজমের মাইটোকনড্রিয়াতে এক বিশেষ জিন এর মিউটেশানের ফলে ওই ঝলসা রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র কোষের মধ্যে থাকা নিউক্লিয়াসের ডি এন এ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকা সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়ার জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একে বলা হয় সাইটোপ্লাজম-উত্তরাধিকার। এর দ্বারা রোগের ছড়িএয় পড়া একটি বিরল ঘটনা। রোগ প্রতিরোধক উত্তরাধিকার একটি বা অনেক গুলো জিন দ্বারা (ওলিগোজেনিক), বহু জিন দ্বারা ছোট ছোট প্রভাব (পলিজিনিক) এবং সাইটোপ্লাজমিক উত্তরাধিকার। হাইব্রিড তৈরীর পদ্ধতিতে এই টি সাইটোপ্লাজম অন্য নতুন জাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফলন বেশী হওয়ার আগেই ব্যপক মড়ক লাগে। এখন যে সমস্ত হাইব্রিড ধানের ও সবজির জাত উদ্ভাবন হয়েছে তা রোগ পোকা সহনশীল নয়, বেশী কৃষিবিষ, সার ও জল লাগে। আবার হাব্রিড ধানে ফুল আসার সময় সামান্য গরম হাওয়া বইলেই ধান চিটে হয় এবং এর ভাত আঠালো, সুস্বাদু নয়। মাঠ জুড়ে একই ধরনের ফসলের চাষ হলে রোগ পোকা বেড়ে যায়। সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি একক ফসলকেই প্রাধান্য দেয়।

পলিপ্লয়ডি ঃ সাধারণত জীবের দেহকোষে জোড় সংখ্যক বা ডিপ্লয়েড ও জনন কোষে এর অর্ধেক সংখ্যক (হ্যাপ্লয়েড) ক্রোমোজোম থাকে। একে n দ্বারা বোঝানো হয়। মানুষের 2n=46 ধানের 2n=24 ইত্যাদি। ক্রমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধিকে পলিপ্লয়েড বলে। সেই ভাবে ট্রিপ্লয়েড =3n, টেট্রাপ্লয়েড =4n, হেক্সাপ্লয়েড =6n। কলচিকাম নামক এক উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত কলচিসিন নামক এক উপক্ষার প্রয়োগ

ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে পলিপ্লয়েড করা হয়। কোষ বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোমের অর্ধেক অংশ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, ফলে কোষে বেশী সংখ্যক ক্রোমোজোম থেকে যায়। এখনকার গম (ট্রেটিকাম এস্টিভাম) প্রাকৃতিক ভাবে ছোটোদানার গম ট্রিটিকাম মোনোকক্কাম এর মিলন ও পলিপ্লয়েডের মাধ্যমে ধাপে ধাপে বহু বছর পরে হেক্সাপ্লয়েড গমের (6n=42) সৃষ্টি হয়েছে।

মিউটেশান ঃ কৃত্রিম উপায়ে জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফসলের মান উন্নয়ন ঘটানো হয়। গামা ও রঞ্জন রশ্মি বীজের উপর প্রয়োগ করলে পরবর্তী প্রজন্মে কিছু উদ্ভিদের পরিবর্তন হয় ফলন বাড়তে পারে, পাতার আকার বড় হতে পারে, পাতার রঙ ও ফলনের পরিবর্তন হতে পারে। এর থেকে জাত নির্বাচন করা হয়। মোটামুটি ভাবে প্রতি ১০০০০ মিউটেশান চাহিদা মত একটি চরিত্র আসতে পারে, অনিশ্চিত বিষয়। এটা এখন স্বাভাবিক ভাবেই বির্তকের বিষয়। কারণ পরিবর্তিত জিন/জিন সমূহ কি আচরণ করবে, চরিত্র সঠিক থাকবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন এসে যায়।

জিন পরিবর্তিত শস্য ঃ জিন কারিগরির (জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) দ্বারা এক প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতিতে খুব সহজেই চালান করে দেওয়া সম্ভব। এ এক অভিনব প্রযুক্তি। এর দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক জিন বিনিময় কোষস্তরে করা সম্ভব। প্রাণীর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিনকে উদ্ভিদের কোষে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। পরিবেশের উপর খোদকারি করবার, প্রকৃতিকে জয় করবার এক অনৈতিক পদ্ধতি। নির্দিষ্ট জীবের জিনের সজ্জা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই সুস্থির অবস্থায় এসেছে। আজকের অনেক উদ্ভিদের / ফসলের মধ্যেও প্রাকৃতিক ভাবে বহিরাগত জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তা সুস্থিত অবস্থায় আসতে সময় লেগেছে লক্ষ বছর। এক একটি জীবের অবয়ব নির্ভর করে তার জিন সজ্জার উপর। একজন মহিলা বা একজন পুরুষ হওয়ার জন্য শরীরের সামগ্রিক জিন সজ্জা দায়ী। একটি বা কয়েকটি জিন মানুষের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ, চুলের, চোখের রং, চুলের ধরণ, বয়ঃসন্ধি আসর সময় (জিনের সুইচ অন হওয়া), রজঃস্রাব বন্ধ ও চোখের বৃদ্ধি বন্ধ (জিনের সুইচ অফ) টাক পড়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের শরীরে কার্যকরী জিনের সংখ্যা প্রায় ২৮০০০। তবে সব জিনের কার্যকারিতা এখনো জানা সম্ভব হয়নি এবং জিনের কার্যকারিতা পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। শরীর কোষে রোগের জন্য দায়ী খারাপ জিন থাকলেই তার বহিঃপ্রকাশ হবেই এমনটা বলা যায়া না। তাই জিন রহস্যময়, এখনো শেষ কথা বলার সময় আসেনি। জিনের কার্যকারিতা বোঝা দুরুহ। একটি জিন একাধিক কাজ/প্রোটিন তৈরী করতে পারে। জিন জীব দেহে প্রতিনিয়ত প্রোটিন তৈরী করে চলেছে অতন্ত্য সুচারু ভাবে। একটি প্রোটিন তৈরী হতে কম বেশী ১০০০ রকমের উৎসেচক লাগে। ভিন্ন বহিরাগত জিন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরী করবে এবং তা শরীরে টিউমার তৈরীর সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয় যা ভবিষ্যতে ক্যানসার হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পাঁচ সাত বছরের জিন সজ্জার রাতারাতি পরিবর্তন করে অভিনবত্ব দাবী করা হলেও তা অস্থায়ী ও পরিবেশের পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ কোন বৈজ্ঞানিক হাজার বছরকে যাদু মন্ত্রের দ্বারা পাঁচ বছরে নামিয়ে আনতে পারবেন না। জিন কারিগরির দ্বারা উৎপাদিত জীবনদায়ী ঔষধের বিষয় স্বতন্ত্র কারণ অধিবিষ এতে থাকে না।

এটা একটা জটিল, অভিনব ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সহজ কথায় বিশেষ গুণ সম্পন্ন জিনটিকে চিহ্নিত করে জিনটিকে কোষ থেকে বের করে আনার পর এর সঙ্গে প্রমোটার, যা অন্য প্রজাতির দেহে কাজ করতে সাহায্য করবে, মার্কার জিন (যার দ্বারা বহিরাগত জিনটি প্রবেশ করেছে কিনা বোঝা যায়) ইত্যাদি বিশেষ কায়দায় জিন 'গান' দ্বারা বা ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া প্লাসমিড দ্বারা ভিন্ন কোষে প্রবেশ করানো হয়। প্রয়োজনীয় জিনটিকে চিহ্নিত করবার পর রেসট্রিকশন উৎসেচক (ইকো আর আই-মানুষের অন্ত্রে থাকা জীবানু এসচেরিচিয়া কোলাই থেকে প্রাপ্ত উৎসেচক) দ্বারা কাটা হয়, কাটা অংশটি ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এর নির্দিষ্ট (প্লাসমিড) জায়গায় জোড়া হয়। একে বলা হয় রিকমবিনান্ট ডি এন এ। ব্যাকটেরিয়ার মূল ক্রমোজোম ছাড়া অনেক ছোট ছোট বৃত্তাকার ডি এন এ অনু থাকে, একে প্লাসমিড বলা হয়। (রিকমজিন্যান্ট ডি এন এ-কে পোষক কোষে প্রবেশ করিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। এসচেরিচিয়া কোলাইকে) রিকমবিনান্ট ডি এন এর পোষক কোষ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় ওই জীবানুর কোষে প্রবেশ করবার পর বিশেষ জিনটির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ কম সংখ্যক বিশেষ জিনটিকে নিয়ে কাজ করা মুশকিল। এর পর উদ্ভিদ

অনুযায়ী জিন গানের (বন্দুক থেকে বুলেট ছোড়ার মত) সাহায্যে তড়িৎ গতিতে কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর ক্রমোজোমে থাকা ডি এন এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, বহিরাগত জিনের স্থানান্তরণ হয়। প্রত্যেকটি যে সফল হবে তা নয় তাই অনেক গুলি ছোড়া হয়। আবার ছোলা মটর ইত্যাদি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংখ্যায় বর্ধিত বিশেষ জিন (রি কমবিনান্ট ডি এন এ- প্লাসমিড) মাটিতে বসবাসকারী জীবানু আগ্রোব্যাকটেরিআম টামেফাসি এন্স দ্বারা প্রয়োজনীয় উদ্ভিদে স্থানান্তর করা হয়। এটাই হল জিন পরিবর্তিত শস্য।

টিসু কালচার পদ্ধতিতে সেই কোষের (উদ্ভিদের) বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে উদ্ভিদ তৈরী করা হয় এবং দেখা হয় সেই বিশেষ জিনটির কার্যকারিতা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। মার্কার জিন এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে। পরে জাতটির চরিত্রকে সুস্থায়ী করা হয় ব্যাক ক্রশ ইত্যাদি প্রচলিত বংশগতির নিয়ম কানুন মেনে এবং এর বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। স্বাভাবিক কারণে বহিরাগত জিনটিকে জিনোম (মূল জিন সজ্জা) সর্বদাই পরিত্যাগ করবার চেষ্টা করে।

বিটি হল মাটিতে বসবাসকারি একটি জীবানু-ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস এর সংক্ষিপ্ত নাম। এই জীবানুর কোষে থাকএকটি বংশানু (জিন) একটি অধিবিষ তৈরী করে স্বাভাবিক ভাবে, কিন্তু এর প্রভাবে নিজে মারা পড়ে না। যেমন সাপের বিষের প্রভাবে সাপ মারা যায় না। মাটি থেকে বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ছিটকে আসা এই জীবানু-বীজ বা স্পোর পাতায় থাকতে পারে। পাতা খাওয়ার মাধ্যমে কোন লেদাপোকার পাকস্থলীতে জীবানু প্রবেশ করলে জীবানু সৃষ্ট অধিবিষের প্রভাবে লেদাপোকার পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং লেদাপোকা মারা যায়। ফসলের লেদা পোকা (শুঁয়োবিহীন শুঁয়োপোকা) নিয়ন্ত্রণের জন্য মাটি থেকে সংশ্লেষ করে বিটি স্প্রে নামে বাণিজ্যিক ভাবে এই জীবানুর ব্যবহার হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের বেশী, আপাত কোন সমস্যা ছাড়াই। এটি পরিবেশ বান্ধব এবং কম খরচের। সাধারণত সর্বাধিক ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কার্যকরী। অধিবিষ সৃষ্টিকারি এই বিশেষ জিনটিকে (ক্রাই ১ এ সি) চিহ্নিত করার পর জৈব প্রযুক্তির এক বিশেষ কায়দায় অন্য কোন ফসলের কোষে প্রবেশ করিয়ে দিলে এবং ওই জিনটি কার্যকর হলে গোটা উদ্ভিদটাই কীটনাশক উদ্ভিদ হয়ে উঠবে। লেদা পোকার জন্য আর স্প্রে করবার দরকার হবে না। ফলে কানা বেগুন কম হবে। এই ভাবে তৈরী ফসল হল বিটি ফসল বা এক বিশেষ জিন প্রতিস্থাপিত ফসল। ব্যাপারটা অভিনব হলেও প্রশ্ন অনেক। বাইরের থেকে দেখে এই ফসলের সঙ্গে অন্য ফসলের কিছু তফাৎ বোঝা যাবে না। তফাৎ কোষস্তরের বংশাণুতে।

জিন কারিকুরি ফসল মূলত চর রকমের। বিটি ফসল, (তুলো, বেগুন, ভুট্টা) আগাছা প্রতিরোধক ফসল (সয়াবিন, ধান, ভুট্টা, সুগারবীট), অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ (ভিটামিন এ, লোহা সমৃদ্ধ ধান), জিনের কার্যকারিতা বন্ধ করা (দেরীতে পাকাবে এমন টমাটো ফ্লভর সভর)।

দেরীতে পাকবে এই টমাটো ছাড়ার তিন বছরের মধ্যেই জনস্বার্থে বন্ধ হয়ে যায়। ওই টমাটো খাওয়ার ফলে ইঁদুরের পাকস্থলীতে ক্ষতসৃষ্টি হয়। অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ধানের ধোকাবাজির কথা ধরা যাক। রাতকানা নিবারক এই 'গোল্ডেন' রাইসের ১০০ গ্রাম চালে আছে ১৩৩ মাইক্রোগ্রাম (১ মাইক্রোগ্রাম = ১ মিগ্রার হাজার ভাগের এক ভাগ)। গরমে ভাত হওয়ার পর কি দাঁড়াবে এবং এই চাল খেয়ে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তা অজানা থাকে তা ছাড়া এর দাম অনেক। অথচ, সমপরিমান বাংলার কচু। শাক, সজনেপাতা ইত্যাদিতে ৮০০০ মাইক্রোগ্রাম বিটা ক্যারোটিন (যা থেকে ভিটামিন-এ তৈরী হয়) থাকে। তবুও লোহা সমৃদ্ধ ধানের ওই ধাপ্পা। গর্ভবতী মায়েদের রক্তাল্পতার জন্য দেশজ অনেক শাক পাতা, লালচাল যেমন ভুত মূড়ি, কেলাস, আসামের কোলাজোহা ইত্যাদি ভিটামিন বি সমৃদ্ধ চালের ফ্যান ভাত খাওয়ানো এবং লোহার পাত্রে রান্না করার প্রচলন ছিল, এই ধানেও বেশী লোহা থাকতে পারে। ইদানিং কিছু দেশি জাতের ধানে লোহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে এই নিয়ে কাজ চলছে। যেখানে মাত্র ১০-১৫ পয়সা দামের আয়রন ট্যাবলেট দেওয়ার কথা মনে থাকেনা সেখানে ওই বিতর্কিত জি এম লোহা সমৃদ্ধ চালের কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রসঙ্গত, শরীরে লোহা শোষণের সঙ্গে ভিটামিন বি এর সম্পর্ক আছে।

নাগপুরের কেন্দ্রীয় তুলো গবেষণা কেন্দ্রের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিটি তুলোর ফল ছিদ্রকারী পোকা বেশী কীটনাশক দিয়ে মরছে না, প্রতিরোধক শক্তি জন্মেছে। আবার বিটি তুলোর গৌন রোগপোকা যেমন শোষক পোকা, ঢলে পড়া রোগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বেড়েছে ফলে কীটনাশকেরও

ব্যবহার বাড়ছে। ফলে কৃষককে বাধ্য হয়ে বেশী দাম দিয়ে পেটেন্ট করা বিটি তূলোর বীজ এবং সেই সঙ্গে বেশী কীটনাশক কিনতে হচ্ছে। এদিকে রোগ প্রতিরোধক্ষম দেশী তূলোর বীজ বাজারে নেই। এই ভাবে বীজের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষককে সম্পূর্ণ ভাবে কোম্পানীর উপর নির্ভর হতে হয়। আমেরিকায় আগাছা প্রতিরোধক জি এম সয়াবীন চাষের জন্য কীটনাশকের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে।

বিটি তূলো, আলুর ক্ষেতে কাজ করার ফলে মানুষের শরীরে অ্যালার্জি দেখা গিয়েছে। শিশুদের শরীরে এলার্জির প্রভাব বেশী। ২০০৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারঙ্গলে বিটি তূলো কেটে নেওয়ার পর ওই জমিতে পড়ে থাকা বিটি তূলো পাতা খাওয়ার ফলে প্রায় ৭০০ ভেড়ার মৃত্যু হয়। জিন শস্যের পরাগ রেণু খাওয়ার ফলে প্রজাপতি, বন্ধু পোকা ইত্যাদির মারা পড়েছে। গোখাদ্য বিটি ভুট্টা খাওয়ার ফলে বেশ কিছু গবাদিপশুর মৃত্যু ঘটেছে জার্মানীতে। জিন ফসলের এই রকম অনেক বিরুপ মারাত্মক উদাহরণ আছে।

বিটি বেগুন বিটি তুলোর মতো। আমাদের চেনা কানা বেগুনের জন্য দায়ী ফল ছিদ্রকারী লেদা পোকার অক্রমণ কম হবে, বিষ কম লাগবে বলে দাবী করা হয়েছে। বিটি বেগুনের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আর বেগুনে ফল ছিদ্রকারী পোকা সব মরশুমে হয় না, সাদা ডিম বেগুন, মাকড়া বেগুনে খুব কম লাগে। বেগুনে সাদা মাছি, শোষক পোকা, ফল ও কান্ড পচা, তুলসী রোগ এগুলো বড় সমস্যা।

ভারতে বিটি বেগুন খাদ্য হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রতি ব্যাচে মাত্র তিনটি ইঁদুরকে খাওয়ানো হয় যেখানে আর্ন্তজাতিক নিয়ম আছে ঔষধের মাত্রা অনুযায়ী প্রতি ব্যাচে ১০টি করে ইঁদুরকে খাওয়াতে হবে। মোট ৯০ দিনের এই রকম পরীক্ষার পর বিটি বেগুন খাদ্যের জন্য নিরাপদ বলা যায় কি? সাধরণ জ্ঞান কি বলে? অন্য দিকে মানুষের গড় আয়ু ৬০-৭০ বছর আর ইঁদুরের বড়জোর দুবছর। জিন শস্য খাওয়ার পর মানব শরীরে এর প্রভাব অনেক দেরীতে দেখা দিতে পারে এবং এর ইমুনোলোজিকাল, টক্সিকলজিকাল পরীক্ষা করা অনেক জটিল, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। আপাত দৃষ্টিতে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও ভবিষ্যতে দেখা দেবে না বা এই ফসল নিরাপদ এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

মার্কার এসিসটেড সিলেকশান/ব্রিডিং ঃ

জীবের বেশীর ভাগ বৈশিষ্ট্যই বিভিন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জিনের কার্যকারিতা / বহিঃপ্রকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। আসলে অনেক গুলো নন-আলেলিক জিন ক্রমোজোমের বিভিন্ন লোকাসে উপস্থিত থেকে একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা পলিজিনের কাজের উদাহরণ। দুই বা ততোধিক জিন বা তাদের পারস্পরিক মিথঃক্রিয়া বা পরিবেশের সঙ্গে মিথঃক্রিয়ার দ্বারা কোন বাহ্যিক চরিত্রকে প্রকাশ করে। এই জিন গুলির বংশপরম্পরায় সঞ্চালনকে পলিজেনিক উত্তরাধিকার বলে। জিনের সংখ্যা যত বেশী ফেনোটাইপের (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য) সংখ্যা তত বেশী। যেমন বেশী দুধ দেওয়া, ফলন ও বীজের আকার, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, খরা নোনা ও গভীর জল সহনশীল উদ্ভিদ, উচ্চতা, ত্বকের রং, ভুট্টার ফুলের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। ফলে দুটি প্রান্তীয় চরিত্র, চরম ফেনোটাইপের (সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা ও সর্বনিম্ন উচ্চতা) মাঝে অনেক গুলি ফেনোটাইপ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। একে বলা হয় ধারাবাহিক প্রকরণ এবং বংশপরম্পরায় এই জিন গুলির সঞ্চালনকে পরিমানগত বা কোয়ানটিটেটিভ উত্তরাধিকার বলে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন (বা জিন সমূহ) ক্রোমোজোমে থাকা ডি এন এর নির্দিষ্ট জায়গায় (লোকাস / লোসাই) থাকে। একে বলা হয় কোয়ানটিটেটিভ ট্রেট লোকাস বা কিউ টি এল। এটা বিভিন্ন ক্রমোজোমে পাওয়া যেতে পারে। এর সংখ্যা দ্বারা ফেনোটাইপের প্রকরণ চরিত্র জানা যায়।

প্রথাগত প্রজননে সংকরায়নের পর খোঁজা হয় চাহিদা মত চরিত্রটি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে কিনা। বীজ লাগিয়ে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ক্রশ করার পর বিশেষ চরিত্রের খোঁজ পাওয়া খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত। আনবিক মার্কার আবিষ্কার হওয়ার পর ওই অসুবিধা দুর হয়ে গেল। এটা অনেকটা মোটাল ডিটেক্টরের মত কাজ করে। ধানের ঝলসা প্রতিরোধের জন্য ২৫টি জিন ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট জায়গায় আছে। প্রথাগত পদ্ধতিতে ওই জিনগুলি আধুনিক জাতে সঞ্চারিত করতে অনেক সময় লাগবে। ডি এন মার্কার নির্দিষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট চরিত্রের জন্য লোকাসকে চিহ্নিত করে পিতামাতা ফোনোটাইপকে বাছা হয়। সব উদ্ভিদকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্রশ করবার পর বীজ এমন কি চারা গাছের থেকে ডি এন এ সংশ্লেষ করে পি সি আর (পলিমেরাইজড চেন রিঅ্যাকশন) এর মাধ্যমে দেখে নেওয়া হয় ওই চরিত্রটি বীজের /চারার মধ্যে এসেছে কিনা। যদি আসে তা নতুন জাত হিসাবে নির্বাচিত করা যাবে (মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন) বা মার্কার

একটি ধানের ক্ষেত থেকে বহু রকমের আজোয়া ধানের শীষ থেকে নতুন জাত উদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকে।

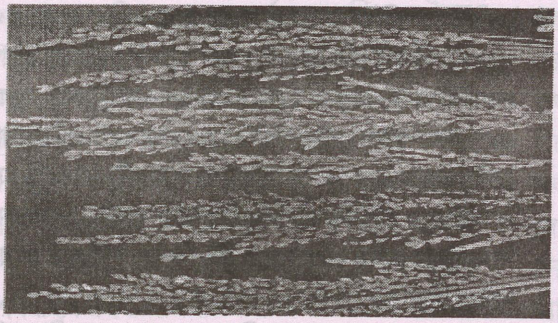

ধন্য এক ঘাস টিওসিনটের সঙ্গে মিলনের ফলে আধুনিক ভুট্টার উদ্ভব (জর্জ বিডেল)

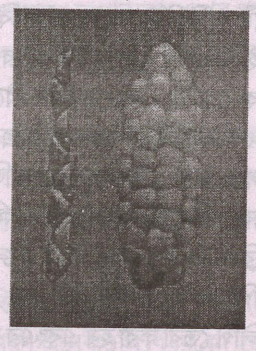

ব্যাক ক্রশ পদ্ধতি

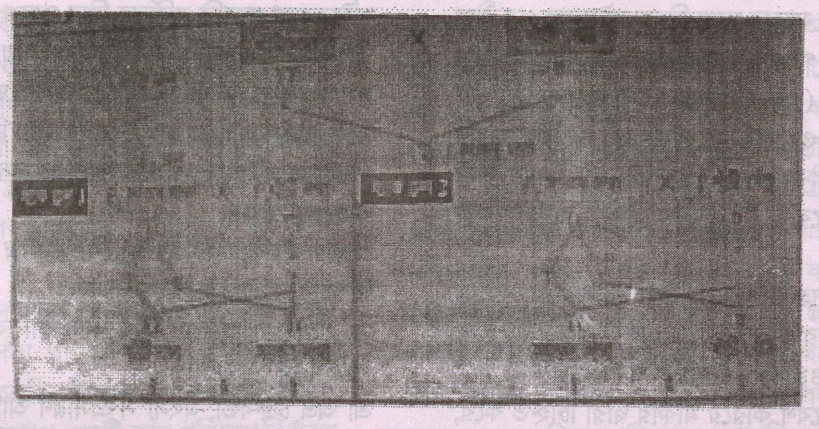

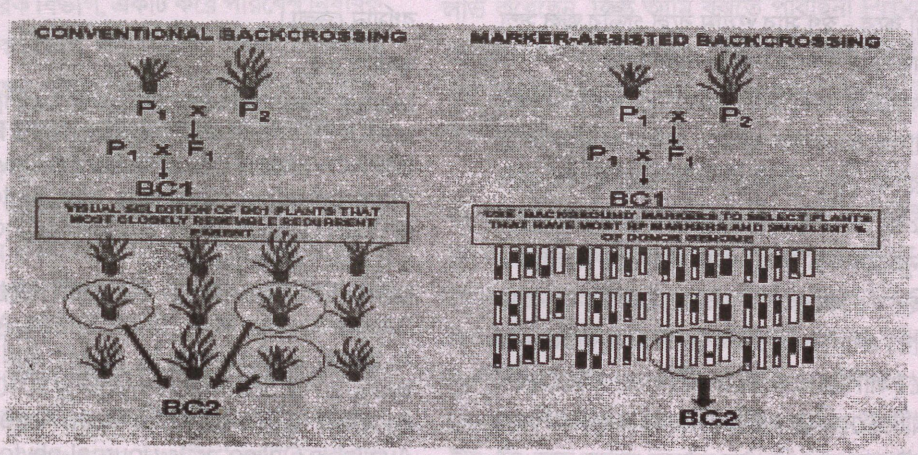

এসিস্টেড ব্রিডিং এ কাজে লাগবে। এখানেও চরিত্রকে সুস্থির করবার জন্য পিতামাতার সঙ্গে ব্যাক ক্রশ করা হয়। সহজ কথায়, ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া আনবিক মার্কার হল জিনোমের (সব জিনের সমাহার) একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যার বিশেষ কোন কার্যকারিতা নেই। এগুলো মূলত দুই ধরণের এবং এগুলি হল ডি এন এ বা প্রোটিন। বিশেষ জিন বিশেষ প্রোটিন তৈরী করে। লিংকড মার্কার বিশেষ চরিত্রের জন্য দায়ী জিনটির সঙ্গে লেগে থাকে যদিও তা বিশেষ জিনটির অংশ নয়। ডাইরেক্ট মার্কার জিনটির অংশ। এই মার্কারকে চিহ্নিত করা এবং (নিউক্লিওটাইডের নাইট্রোজেন যুক্ত বেস) সজ্জা নিরুপণ করে পি সি আর দ্বারা ডি এন এ-র নির্দিষ্ট অঞ্চলটির প্রতিলিপি তৈরী করা হয় এবংএর ব্যান্ড প্যাটার্ণ পরীক্ষা করা হয়।

নির্দিষ্ট পিতা মাতার মধ্যে মিলন ঘটানোর পর বীজ সংগ্রহ করে চারা গজিয়ে বা বীজ থেকে ডি এন এ সংশ্লেষ করে পিসিআর (পলিমরাইজড চেন রিআকশন) এর মাধ্যমে দেখে নেওয়া যায় বিশেষ চরিত্রটি ওই বীজ/চারার মধ্যে এসেছে কিনা। এবং পরে তা ক্রশ করার জন্য পিতামাতা হিসাবে বা নতুন জাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

গভীর জল সহ্যকারী ধানের জিন হল সাব ওয়ান এবং এর নির্দিষ্ট মার্কার চিহ্নিত হয়েছে একটি ধানে। এই জিন টিকে আইআর ৪৯৮৩০-৭ নামক ধান থেকে অন্য ধানে (স্বর্ণ-গ্রহীতা) প্রবেশ করিয়ে মার্কার দ্বারা চিহ্নিত করে, জাত তৈরী করে - স্বর্ণ সাব ওয়ান বলে গভীর জল সহ্য কারী ধানের জাত হিসাবে বিতরণ করা হচ্ছে।

বন্য টমাটোতে থাকা নেমাটোড প্রতিরোধক জিন (এম আই) প্রথাগত প্রজননের মাধ্যমে চাষ করা টমেটোতে প্রবেশ করানো বেশ মুশকিল। প্রতি প্রজন্মে যথাক্রমে ৫০%, ২৫%, ১২.৪% এবং ৬.২৫% করে বন্য অবাঞ্ছিত জিনের অনুপ্রবেশ ঘটে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে। বহু প্রজন্ম পরেও চাহিদা মত জিনের সঙ্গে ওই বন্য জিনটির সহাবস্থান পাওয়া যায়। প্রথাগত মতে ওই ক্রশ করানো টমাটোর বীজ জমিতে লাগিয়ে এবং প্রত্যেকটি গাছে নেমাটোডের সংক্রমণ ঘটিয়ে দেখা হয় ওই জিনটির প্রভাব খাটছে কিনা। যদি নেমাটোড সংক্রমণ না হয় তাহলে বুঝতে হবে ওই গাছ গুলোতে ওই জিনের প্রবেশ ঘটেছে এবং জিনটি কাজ করছে। বিশেষ আইসোজাইম মার্কার পরীক্ষায় দেখা যায় বিশেষ আইসোজাইম ওই জিনের সঙ্গে লেগে থাকে এবং তা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এর জন্য কয়েকটা চারা তৈরী করে পরীক্ষা করা যায়, প্রচুর সংখ্যক গাছ লাগানো ও পরীক্ষার দরকার নেই। ইদানিং কালে বড় শপিং মলের বিক্রীত দ্রব্যাদির গায়ে, বইয়ের বাইরে এক বিশেষ বার কোড থাকে। এর ব্যন্ডিং প্যার্টন দেখে (পিসিআর) বোঝা যাবে এটি কোথায় তৈরী, দাম কত, কবে সরবরাহ করা হয়েছে ইত্যাদি। ডি এন এ মার্কারের প্যার্টান ওই চরিত্রের অন্য সার্ন্টাড প্যার্টানের সঙ্গে তুলনা করে বলা যাবে ওই বিশেষ চরিত্রের প্রবেশ ঘটেছে কিনা।

এই ভাবে অন্যান্য জাত তৈরী হচ্ছে এবং এর সুবিধাগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জিনকারিকুরি শস্যের মত বাইরের বা প্রজাতি বর্হিভুত জিন প্রবেশ করানো হয় না - তাই এই শস্যের ঝুঁকি নেই, বিতর্কিত নয়। খরচ কম, সময় সংক্ষেপ করে। নির্দিষ্ট জিনটিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে অন্য জাতের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। জিন শস্যের বিকল্প হিসাবে এই পদ্ধতি একটি আর্দশ পদ্ধতি কিন্তু এর প্রসার ও প্রচার নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, বিশিষ্ট বীজ বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সফিকুল আলম, কৃষি আধিকারিক, হাওড়া সদর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী অভ্র চক্রবর্তী, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, বুদবুদ, বর্ধমান জেলা।

তথ্য সূত্র ঃ

Marker assisted selection, www.wikipedia.com

MARKER - ASSISTED BREEDING FOR RICE IMPROVEMENT, Bert Collard & David Mackill Plant breeding, Genetics and Biotechnology (PBGB) Division, IRRI, bcycollard@hotmail.com & d.mackill@cgiar.org

MARKER ASSISTED SELECTION IN RICE, Sabina Akhtar, M. A. Bhat, Shafiq. A. Wani, K. A. Bhati, S. Chalkoo, M. R. Mir and Shabir. A. Wani, 2010, Journal of Phytology 2010, 2(10):66-81 ISSN : 2075-6240 An Open Access Journal Available Onlice : www.journal-phytology.com

ভারতের জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিল

পুষ্প মিত্র ভার্গব
bhargava.pm@gmail.com

বর্তমানে ভারতে ও বিশ্বের অন্যত্র সর্বস্তরে প্রচলিত যে জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা তা ত্রুটিযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ। এই কারণে পরিবেশ এবং বনপ্তরের মন্ত্রী জয়রাম রমেশ Bt বেগুনের ব্যবহারের উপর অনির্দিষ্টকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। যদিও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের (কমিটির) ছাড়পত্র ২০০৯ সালের ১৪ই অক্টোবরেই পেয়ে যায়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য অগষ্ট ২০১১ তে ভূপালে শতাধিক কৃষক, NGO এবং সমাজকর্মী একটি মেকী শববাহী মিছিল করে জিন-বদলানো (GM) শস্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষারত ব্রাই (BRAI - Biotechnology Regulatory Authority of India) বিলটিতে সমস্ত ঘাটতি বা ত্রুটিগুলিকে দূর করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিলটি সম্পূর্ণরূপে অসাংবিধানিক, অনৈতিক, অবৈজ্ঞানিক, স্ববিরোধী এবং জনবিরোধী। বিপুল পরিমাণে ত্রটিযুক্ত এবং অপ্রতুল ব্রাই বিলটি যদি অনুমোদন পায় তবে শস্য, মানবস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

ব্রাই-এর সদস্যদের মধ্যে তিনজন পূর্ণসময়ের ও দুইজন আংশিক সময়ের সদস্য থাকবেন। প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী আধিকারিক দ্বারা চালিত তিনটি বিভাগ থাকবে এই ব্রাই-এ। একটি ঝুঁকি নির্ধারক বিভাগ, একটি করে পরিবেশ নির্ধারক বিভাগ, পর্যবেক্ষক বিভাগ, পণ্য নিয়ন্ত্রক বিভাগ, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, আন্তমন্ত্রক শাসক বিভাগ, জৈবপ্রযুক্তি উপদেষ্টা, রাজ্য জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন, এনফোর্সমেন্ট বা বলবৎকারী বিভাগ এদের সাহায্যের জন্য থাকবে।

যে সমস্ত আমলারা এইসমস্ত সংগঠনের শীর্ষস্থান অধিকার করবেন, বেশীরভাগই হবেন তাঁরা যাঁরা আধুনিক জৈব প্রযুক্তির জটিল বিষয়গুলি ও তার সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানেন না।

এই বিলে কোনো সুশীল সমাজের (জন প্রতিনিধির) অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। এমনকি BRAI কোনো সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রাহ্য করবে না যদিও বিলটি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। সরকারী কোন কোন দপ্তর বা বিভাগ ব্রাই-য়ের অন্তর্গত তাও পরিস্কার নয়।

বিলের ৮১-৮৬ ও ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্রাই আইনই অন্য সব আইননের উর্দ্ধে প্রাধান্য পাবে অথচ অন্যত্র কোনো ধারায় দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য আইনও সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে।

আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির যে সংজ্ঞা আর্টিকল 3(r) -এ বলা হয়েছে তা অসম্ভব কারণ অনেকগুলি বিষয়কে (২৫টির বেশী) এর বাইরে রাখা হয়েছে, সেগুলি আধুনিক জৈব প্রযুক্তির অন্যতম বিষয়। এমন কিছু গবেষণার বিষয়আছে যেগুলি ব্রাই-এর অনুমোদন ছাড়া বেআইনি হয়ে দাঁড়াবে।

এমন হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুল চর্চিত এইসব অত্যাধুনিক বিষয় ব্রাই এর অনুমতি ব্যতীত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো যাবে না। আরো মজার কথা হল এই যে প্রথম তপশিলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে cloned animals যাদের প্রধান বিলে কোনও উল্লেখ নেই। আমি বহুদিন যাবৎ আধুনিক জীববিজ্ঞান চর্চা করছি। গত প্রায় ছয়দশক ধরে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ খুব কাছ থেকে অনুধাবন করছি। আমার বন্ধুদের অন্তত ২০ জন নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা Products of Synthetic Biology বলতে কি বোঝানো হয়েছে। এবং যদি BRAI মানতে হয় কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন ভারতে সম্ভব হবে না।

জনমুখী বিল করতে হলে যা প্রয়োজন তাহল জিন বদল করে উৎপাদন করতে হলে কিছু পদ্ধতি নির্দেশ করা। প্রথম পর্যায়ে সামাজিক ও আর্থসামাজিক দিক দিয়ে কতটা তার প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ এবং নিরূপণ করা। যদি সেরকম প্রয়োজন থাকে তবে অন্যরকমভাবে, আরো ভাল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পন্থায় তা করা যায় কিনা দেখতে হবে। যেমন আনবিক বংশবৃদ্ধি পদ্ধতি, জৈব কৃষি, অথবা জৈব কীটনাশকের ব্যবহার করা। সর্বোপরি বলা যায় যে, GM

শস্যের ক্ষেত্রে কোনো একটি পরীক্ষার মাধ্যমে GM শস্যের জনগনের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হবে এবং কে সেই পরীক্ষা করবে তাও ঠিক করতে হবে।

এই বিলে এরকম কোনো স্বাধীন পরীক্ষাগারের উল্লেখ নেই। GM খাদ্যদ্রব্যের উপর কোনো বিধিবদ্ধ ঘোষণার কোন কথা বিলে নেই। এবং এই বিলে সেইসব কৃষকদের জন্য কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই যারা নিজেরা জৈব চাষ করলেও পাশের GM শস্য ক্ষেত থেকে তাঁর ফসলে GM সংক্রমণ ঘটে যেতে পারে।

অনু ৬২তে আইন লঙ্ঘন ও শাস্তি অংশটি (offences and penalties) নজিরবিহীন। এখানে বলা হয়েছে যে যদি কেউ GM শস্যের বিরুদ্ধে কথা বলেন তবে ব্রাই তাকে প্রয়োজনে তিন মাস কারাদন্ড এবং ৫ লাখ টাকা জরিমানার শাস্তি দিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্রাই কি ভিত্তিতে এই শাস্তি দিল তা জানাতেও বাধ্য নয় এবং কোনো সুশীল সমাজের সদস্য একে প্রশ্ন করতে পারবে না। ব্রাই বিল অনুযায়ী পাঁচজন সদস্যের ওপরই যেন জৈবপ্রযুক্তির সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হবে, বাকী যে এতশত বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের কথার কোনো দামই থাকবে না।

একজন কেউ এই বিলের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। কারণটা খুবই স্পষ্ট। পৃথিবীতে খাদ্য ব্যবসাই হচ্ছে সবথেকে বড় ব্যবসা এবং যে এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে সে পক্ষান্তরে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এখন এই ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শস্য এবং শস্য রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি যারা এইসব রাসায়নিক এবং কীটনাশক তৈরী করে, তারা এখন এই জিন বদলানো শস্যের দ্বারা এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এই সংস্থাগুলি আমেরিকার এবং আমেরিকা সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত। এমনকি আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে এখন প্রধান কলহের বিষয় হল ইউরোপ এই জীনবদল পদ্ধতিতে উৎপাদিত শস্যের বিরোধী এবং যেসকল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ০.৯ শতাংশ এইরকম জিন-বদলানো উপাদান আছে তার প্যাকেটের গায়ে লিখিত ঘোষণা থাকতে হবে (labelling)। আমেরিকায় এরকম কোনো পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই এবং সেদেশের নাগরিকরা জানেও না তারা কতোটা এই জিন পরিবর্তিত খাদ্য খাচ্ছেন।

কিছু বছর আগে পর্যন্তও জিন পরিবর্তিত শস্যের উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধতা ভারতে ছিল না। এবং সত্যি বলতে কি ভারত সরকার যে পন্থায় জিন পরিবর্তিত দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করছিল তা আসলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য সফল করছিল।

কিন্তু এরপরই ভারতীয়রা এই বিষয়ে তথ্য পেল এবং বহুজাতিক সংস্থার, আমেরিকার এবং সর্বোপরি ভারতের শাসকবর্গের চাহিদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হল।

ইদানিংকালে অন্তত পক্ষে পাঁচটি রাজ্য (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, কর্নাটক এবং হিমাচল প্রদেশ) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা কোনোরকম জিন পরিবর্তিত শস্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা ব্যবহার করতে দেবে না। অর্থাৎ এখনকার এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে - আমেরিকা এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির লোভ চরিতার্থ করা যাবে না। কিভাবে ব্রাই-এর থেকে ভালো কিছু করা যায় তা সরকারকে ভাবতে হবে। ভারতসরকারকে সাধারণ জনগণের সম্মিলিত চেতনাকে গুরুত্ব ও মর্য্যাদা দিতে হবে।

'দ্য হিন্দু', ২৬.১২.২০১১ তে প্রকাশিত।

সংক্ষেপিত ভাবানুবাদঃ সুমনা চক্রবর্তী।

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কালধ্বনি

যোগাযোগ ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ টেলি : ৩০৯৪ ৬৪৪০

e-mail : kalodhvani@yahoo.co.in

বিশেষ আলোচনা

শক্তি সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্ব বনাম ভারত

রবীন ব্যানার্জি
rabibanerjee@gmail.com

জার্মান রাষ্ট্রপ্রধানকে পাশে বসিয়েই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন "পরমানু বিদ্যুৎ ছাড়া ভারতের বিদ্যুৎ সমস্যা মিটবে না। আগামী 2020 সালের মধ্যেই ভারতে 40,000 মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে"। অথচ সেই জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান, কদিন আগেই (জাপানের পারমানবিক বিপর্যয়ের পরপরই) ঘোষণা করেছেন " 2020 সালের মধ্যেই জার্মানির সব ধরণের পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে"। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের লক্ষ্য দুই দিকে। ভাবিয়ে তুলবে আপনাকে, আমাকে, সবাইকেই।

ভারতের পরমানু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা 4,120মেগাওয়াট। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের 3 শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে? বছরে কত ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে? যেখানে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পড়ে প্রতি ইউনিট 2.51 টাকা সেখানে দেশি প্রযুক্তির পরমানু বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পড়বে 3.61 টাকা, বিদেশী প্রযুক্তিতে 5.07 টাকা। (htpp.// www.uic.com.au/nip08.htm)। সরকারি তথ্য, ন্যাশনাল গ্রিডের মাধ্যমে গোটা ভারত জুড়ে বিদ্যুৎ পরিবহন নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও বন্টনে অপচয় 40 শতাশ। বিদেশে আজ হাইভোল্টেজ ডি সির দ্বারা এই অপচয় দুই শতাংশেরও নিচে নিয়ে চলে এসেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী পরমানু বিদ্যুতের স্বপ্ন দেখে চলেছেন। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র না করে পরিবহন ও বন্টনের অপচয় কমালেই তো 40,000 মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যে দেশে 40 শতাংশ মানুষের ঠিকঠাক ভাবে মাথা গোঁজার স্থান নেই, 60 হাজার গ্রামে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে "2012 সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ, সবার জন্য জ্বালানি" গল্প ছাড়া আর কী হতে পারে? কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থার (CEA) তথ্য বলছে ভারতের প্রতিটি মানুষ বছরে 630 Kwh বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, আগামী দিনে 1000 Kwh ব্যবহার করবে। তথ্যটা কীভাবে এলো বোঝা যাচ্ছে না। 40 শতাংশ মানুষ, 60,000 এর বেশি গ্রামে তো বিদ্যুৎটাই নেই।

প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য 2020 সালের মধ্যে 40,000 মেগাওয়াট পরমানু বিদ্যুৎ। কিন্তু যোজনা কমিশনের Integrated Energy Policy 2006 বলছে অন্য কথা। 2015 সালের মধ্যে 15,000 মেগাওয়াট এবং 2021 সালের মধ্যে 29,000 মেগাওয়াট। দুটোই, যোজনা কমিশনের মতে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা। সর্বোচ্চ ক্ষমতার ওপরে কি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা? খরচটাও একটা ব্যাপার কিন্তু। যোজনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দেশীয় প্রযুক্তির রিয়াক্টর দিয়ে পরমানু বিদ্যুৎ প্রকল্পে খরচ প্রতি মেগাওয়াট 6 কোটি টাকা। সময় লাগে 6 বছর। বিনিযোগের টাকার সুদ তো দিতেই হবে, মোট খরচ দাঁড়াবে 7.4কোটি টাকা, প্রতি মেগাওয়াট। সময় বাড়লে সুদও বাড়বে। বিদেশি প্রযুক্তির রিয়াক্টরে প্রতি মেগাওয়াট দুই মিলিয়ন ডলার। ডলারের দাম 53 টাকা ধরলে প্রতি মেগাওয়াট 10.6কোটি, 6 বছরের সুদ সমতে প্রতি মেগাওয়াট 13 কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য 20,000 মেগাওয়াট দেশি এবং 20,000 মেগাওয়াট বিদেশি। খরচ হবে 4,09,480 কোটি টাকা। পাওয়া যাবে দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র 9 শতাংশ বিদ্যুৎ। এটা না পেলে দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা মিটবে না?

দেশী প্রযুক্তির রিয়াক্টরে একই জ্বালানিকে তিন বার ব্যবহার করা যায়। প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়াক্টর (PWR), জ্বালানি সমৃদ্ধ ইউরোনিয়াম। পাওয়া যায় তাপ, তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, একই সঙ্গে পাওয়া যায় প্লুটোনিয়াম। সেই প্লুটোনিয়ামকে রিপ্রসেস করে জ্বালানি করা হয় ফাস্ট ব্রিডার রিয়াক্টরে (FBR)। সেখানেও উৎপন্ন হবে তাপ, তাপ থেকে বিদ্যুৎ ও সঙ্গে প্লুটোনিয়াম। সেই প্লুটোনিয়মের সঙ্গে থোরিয়াম মিশিয়ে জ্বালানি তৈরী করা হয় অ্যাডভান্সড হেভি ওয়াটার রিয়াক্টরে (AHWR)। পাওয়া যাবে আবার তাপ বিদ্যুৎ। কিন্তু বিদেশি প্রযুক্তি "লাইট ওয়াটার রিয়াক্টর" (LWR) জ্বালানি সমৃদ্ধ ইউরোনিয়াম, একবারই ব্যবহার করা যাবে। পরিস্কার চিত্র 40,000 মেগাওয়াট দেশি ও বিদেশি প্রযুক্তির রিয়াক্টরের জ্বালানি, সেও আসবে বিদেশ থেকে। অতীতে এটাও দেখা গেছে-জ্বালানি পাঠানো বন্ধ

রাখা, যখন তখন দাম বৃদ্ধির প্রবণতা সেই সব দেশগুলোর ছিল। থ্রি মাইলস্ আইল্যান্ড থেকে জাপানের ফুকুশিমার পরমানু চুল্লির বিপর্যয়, হতেই হবে। সেটা বিদেশি উৎপাদকরা ভালভাবেই জানেন। শুধু জানেন না ভারত সরকার। তাই ইউপোপে যখন পারমানবিক বিদ্যুৎ চুল্লির প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ 140 মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে এক বিলিয়ন পাউন্ড (1.6 বিলিয়ন ডলার) করল, তখন ভারত সরকার প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিলেন বিদেশী পারমানবিক চুল্লির বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ। তবে সোলার বিদ্যুতে আছে সেল ট্যাক্স 4 শতাংশ (Vat Sl. No 77C, Schedule C, Pat I. With effect form 01.07, 2005)। প্রশ্নটা তাই উঠে আসে- সত্যিই কি সরকার আমাদের না বিদেশি মৃতপ্রায় শিল্প, পারমানবিক চুল্লি উৎপাদনকারীদের?

মার্কিন মুলুকে গত 30 বছরে কেন একটাও পারমানবিক চুল্লি বসেনি তার উত্তর কিন্তু ভারত সরকার কখনোই দিতে পারেননি, পারেননি ভারতে 2009 সালে 23 নভেম্বরর কোন বিপর্যয়ের জন্য পানীয় জলের মাধ্যমে 86 জনের শরীরে তেজস্ক্রিয় Tritrinium বৃদ্ধি পেয়েছিল। 24 মাস পার হতে গেল, কেউ জানাল না কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কেউ সরকারী ভাবে তিরস্কৃত হয়েছে কিনা, আজও জানা যায়নি। পরমানু বিদ্যুৎ যে নিরাপদ নয় সেটা আবার প্রমান দিল জাপান। এ প্রমান আগেও পেয়েছিল মানুষ। থ্রী মাইলস্ আইল্যান্ড থেকে চেরনোবিলের দুর্ঘটনা। আজও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাচ্ছে, মারণ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। বাতাসে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে পারমানবিক বিষ। আজ আর মানুষের কাছে কোন দ্বিধা নেই। একবাক্যে সবাই চাইছেন পৃথবী থেকে পারমানবিক চুল্লির বিদায়। মানুষের পারমানবিক শক্তির প্রতি ঘৃণা, রাগ, দুঃখ, অভিযোগ এমন পর্যায়ে পৌছাচ্ছে যে রাষ্ট্রনায়করাও ভয় পেয়ে পারমানবিক মুক্ত পৃথিবীর ডাক দিচ্ছেন। তারই কটা চিত্র তুলে ধরা হল।

চিত্র এক

2008 সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) গ্রহণ করে "Integrated Energy and Climate Change" নীতি, যা 20-20-20 নামে পরিচিত। মূল বক্তব্য ছিল 2020 সালের মধ্যে 1990 সালের চেয়ে 20 শতাংশ কম গ্রীন হাউস গ্যাস পরিবেশে ছাড়া, চাহিদার 20 শতাংশ বিদ্যুৎ পুনঃনবীকরণ শক্তির থেকে সংগ্রহ করা এবং যন্ত্রাংশের উন্নতি ঘটিয়ে 20 শতাংশ শক্তির খরচ কমানো। ভাবনা বা নীতিটা আনতে বাধ্য করেছিল মধ্য প্রাচ্যের ক্রুড অয়েলের উর্দ্ধমুখী দাম। 1970 সালে বিশ্ববাজারে ক্রুড অয়েলের মূল্য বৃদ্ধি পশ্চিমের অর্থনীতিকে যে আঘাত হেনেছিল, তার থেকে মুক্তি পেতেই প্রতিটি সদস্য দেশই খুঁজতে শুরু করে মুক্তির পথ। আবিষ্কার করে, সঙ্গে সঙ্গে লাগুও করে, বাড়ি ঘরের তাপ প্রতিরোধ ও উপকরণের মান। 2002 সালেই ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে গৃহীত হয়েছিল Energy Performence of Building Directive (EPBD), প্রযোজ্য হয়েছিল বাণিজ্যিক বাড়ির ওপরেও। অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাঙ্ক-সহজ সরল শর্তে ঋণ দিত। যেন টাকার অভাবে বন্ধ না হয় এই কর্মসূচী। সঙ্গে এনেছিল সদিচ্ছার অভাবের ওপর জরিমানা। কিন্তু বিপরীতে ভারত, একটা উদাহরণ "80 লক্ষ গ্রাহক যদি অপ্রয়োজনীয় সারারাত 60 ওয়াটের আলোটা না জ্বেলে রাখে, বাঁচবে 540 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যার বাৎসরকি মূল্য 2400 কোটি টাকা"। তথ্যটা হিন্দু পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে কেরলের শক্তি মন্ত্রী Aryadan Mohammed-এর শুধু কেরলেরই নয়, গোটা ভারতবর্ষের, যেখানেই বিদ্যুৎ পৌছেছে।

চিত্র দুই

ব্রিটেনের শক্তি মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র Energy Information Administration. তাদের হিসাবে পুনঃনবীকরণ শক্তির পর পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাকৃতিক গ্যাস। তথ্যটা পাওয়া যায় International Energy Outlook 2010 সালের সংস্করণে। বর্তমানে খনির থেকে কয়লা উত্তোলনের যে পদ্ধতি আছে তার সাহায্যে পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লার 45 শতাংশই উত্তোলন করা সম্ভব নয়। তবে তার থেকে কার্বন মনোঅক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রিত Synthesis Gas উৎপাদন করা যায়। পদ্ধতিটা উদ্ভব হয়েছিল 1930 সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। আজ পৃথিবীর বহু দেশ যেমন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ভারতেও এর বাণিজ্যিক উৎপাদন হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে 1999 থেকে 2000 সালে খনির 3500

টন কয়লা থেকে Synthesis Gas উৎপাদন করা হয়েছে। আগামী দিনে অস্ট্রেলিয়ার মাইনিং কোম্পানীর সাথে যৌথ উদ্যোগে খনিতে পড়ে থাকা এক বিলিয়ন টন কয়লা থেকে আন্ডার গ্রাউণ্ড কোল গ্যাসিফিকেসন (UGC) পদ্ধতিতে Synthesis Gas উৎপাদন করার পরিকল্পনা। খরচ ধরা হয়েছে 160 মিলিয়ন ডলার। জ্বালানি পাওয়া যাবে 400 - 600 মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের আগামী 60 বছরের জন্য। H. Rogner-এর গবেষণা থেকে পৃথিবীর গ্যাস ভান্ডারের একটা হদিশ পাওয়া যায়।

চিত্র তিন

জার্মানির সত লক্ষ বাড়ির ছাদ আজ সোলার প্যানেল দিয়ে ঢাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 14,680 মেগাওয়াট। দেশের 11% বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে সোলার প্যানেল থেকে। অথচ গোটা জার্মানিতে সারা বছর যে পরিমাণ-সোলার রেডিয়েশন পাওয়া যায়, তার অনেক বেশী সোলার রেডিয়েশন পাওয়া যাবে ভারতে। তা সত্ত্বেও আজ পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জার্মানি। প্রকৃতির নিয়মেই বছরে বেশ কটা দিন মেঘলা আকাশ, দিনের বেলায় বৃষ্টি, বাধা পায় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন। সমস্যাটা আছে, আগামী দিনেও থাকবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। অথচ বিদ্যুৎ তো চাই ই চাই, তাই পাশাপাশি সর্বদাই রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্যাস জেনেরেটরগুলো, যে কোন অঞ্চলেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে চালু হয়ে যাবে গ্যাস জেনারেটর। পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে। পরিবেশ দুষণ মুক্ত বিদ্যুৎ। সৃষ্টি করেছে কর্মসংস্থান, সৌর কোষ উৎপাদন, বন্টন, প্রতিস্থাপন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 40,000 মানুষকে। 2011 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন 30,000 মেগাওয়াটে পৌঁছে গেছে। বছরে এক হাজার মেগাওয়াট করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় 2030 সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 50,000 মেগাওয়াটে পৌঁছে যাবে। এটা কোন ম্যাজিক বা দুর্ঘটনার জন্য নয়। সব ধরণের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এক লাভ জনক প্রস্তাব। যা এনেছিল 2000 সালে "ফেডারেল সরকার"। প্রস্তাবটা এইরকম। যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাইলে বা উৎপাদন করে নিজে ব্যবহার করতে চাইলে সরকার সহজ শর্তে সর্বোচ্চ 100 শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেবে। সঙ্গে আগামী 20 বছর পর্যন্ত সরকারী অনুদানের অঙ্গীকার। নিজে উৎপাদন করে ব্যবহার করলেও বিদ্যুৎ বিলে সরকারি ভরতুকি পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে, সরকার কিনে নেবে সঠিক দামে। পর্যবেক্ষণ করে সঠিক উৎপাদন করতে পারলে বিশেষ পুরস্কার। সব মিলিয়ে প্রচলিত বিদ্যুতের বদলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ব্যবহার করলে বিদ্যুতের দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ সৌর বিদ্যুৎ উৎপানের দিকে ঝুঁকেছে। ভারতের সমস্ত পাকা বাড়ির ছাদ যদি সোলার প্যানেল দিয়ে ঢাকা যেত, জার্মানীর চেয়ে অনেক বেশি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হত।

গত বসন্তে জার্মান সরকার আনলেন বিকল্প শক্তি বিল। Emergy Concept 2050। দেশকে বিকল্প শক্তির এক দিশা। এক মিলিয়নের মত বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি চলবে। 2050 সালে দেশের প্রয়োজন হবে 509 টেরা ওয়াট আওয়ার (TWh) (100 কোটি ইউনিট /kWh) থেকে 700TWh, তার 80 শতাংশই উৎপাদন করা হবে পুনঃনবীকরণ শক্তি থেকে। বাকীটা আমদানি করা হবে। খরচ গড়ে 6-7 ইউরো সেন্ট (0.079 - 0.092 মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় 4.19 - 4.88 টাকা) ইউনিট /kWh। বসানো হবে 109.6 গিগাওয়াট আওয়ার (GWh) (10 লক্ষ ইউনিট /KWh) সোলার ফটো ভোল্টায়িক পাওয়ার প্লান্ট (SPV) থেকে বছরে পাওয়া যাবে 112.2 টেরা ওয়াট আওয়ার (TWh) উৎপাদন খরচ 8.9 ইউরো সেন্ট প্রতি ইউনিট (KWh)। বায়োমাস থেকে পাওয়া যাবে বছরে 17.1 টেরা ওয়াট আওয়ার, বায়োগ্যাস থেকে পাওয়া যাবে বছরে 17.1 টেরা ওয়াট আওয়ার, জিওথার্মাল থেকে পাওয়া যাবে বছরে 14.6 টেরা ওয়াট আওয়ার, এছাড়া আরও অন্যান্য বিকল্প শক্তিকে ব্যবহার করে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো হবে। ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হবে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। সমুদ্রের 100 কিমি ভিতরে বসানো হচ্ছে Wind Farm। উৎপাদন ক্ষমতা 39.5 গিগাওয়াট। উৎপন্ন বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য 3600 কিমি Submarine Cable পাতা হচ্ছে। এত বিরাট লম্বা বিদ্যুৎ পরিবহনের লাইন। পরিবহন অপচয়টা মাথা ব্যাথার কারণ। নুন্যতম অপচয় যাতে হয় তার জ্য পরিবহন হবে High Voltage Direct Current

(HVDC)। বছরে উৎপাদন হবে 90.6 TWh বিদ্যুৎ, উৎপাদন খরচ 4.7 ইউরো সেন্ট প্রতি KWh (ইউনিট)। শুধু গভীর সমুদ্রেই নয় সমুদ্রের ভিতরেও বসান চলছে Wind Farm। লক্ষ্য 73.2 গিগাওয়াটের। পাওয়া যাবে 316.9 TWh বিদ্যুৎ। উৎপাদন খরচ 4.1 ইউরো সেন্ট প্রতি KWh (ইউনিট)।

চিত্র চার

পৃথিবীবাসীকে অবাক করে পরমানু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পীঠস্থান এবং পরমানু বিদ্যুৎ-এর প্রধান প্রবক্তা ফ্রান্স সমুদ্রের তীরে 600 টা Wind turbine বসিয়ে তিন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে। খরচ ধরা আছে বিলিয়ন ডলার। কর্মসংস্থান হবে 10000 মানুষের। আগামী দিনের লক্ষ্য বায়ুশক্তির দ্বারা 25 গিগাওয়াট প্ল্যান্ট। দেশের 23% বিদ্যুৎ এর মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। খরচ হতে পারে 20 বিলিয়ন ইউরো। জাপানের পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপর্যয় ফ্রান্সকেও বুঝিয়ে দিয়েছে পরমানু বিদ্যুৎ নিরাপদ নয়।

2009 সালে মন্দা অর্থনীতির জন্য সব ধরণের ব্যবসায় বিনিয়োগ কম হওয়া সত্ত্বেও Wind Turbine Industryতে বিনিয়োগ 31.9 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা বিশ্বে বায়ুশক্তির থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ আজ 158.5 গিগাওয়াট। ফলে পরিবেশে 2007-2010 সালে 190 মিলিয়ন টন CO_2 কম এসেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 4.8 শতাংশ 74700 মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ুশক্তির প্লান্ট বসিয়ে পঁচিশ লক্ষ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত 30 বছরে একটাও পরমানু বিদ্যুৎ প্রকল্প বসায়নি। বরং 35064 মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ভারতে 10900 মেগাওয়াট, জাপানে 2100 মেগাওয়াট, দক্ষিণ কোরিয়ায় 348 মেগাওয়াট, তাইওয়ানের 436 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বায়ুশক্তির থেকেই উৎপাদন হচ্ছে।

চিত্র পাঁচ

ইউরোপের ছোট রাষ্ট্র নরওয়ে। দিনকে দিন বেড়েই চলেছে বিদ্যুতের চাহিদা। ঘাটতি উৎপাদনের। আরও উৎপাদন করতে হবে। শুরু হল অনুসন্ধান। সমুদ্রের ধারে বায়ুর গতি যা তাতে উইন্ড মিল বসিয়ে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মিটবেনা। অনুসন্ধানে পাওয়া গেল খোঁজ। দেশের পশ্চিম কোণে গভীর সমুদ্রে অতলান্তিক মহাসাগরে প্রচুর হাওয়া। উইন্ড মিল বসাতে হবে সেই জায়গায়। গভীর সমুদ্র, তাই বানানো হল 5000 টন ওজনের Platform, তারই ওপর বসান হল 80-90 মিটার খাড়াই লম্বা Wind Mill Tower, জোড়া হল 40 মিটার লম্বা তিনটি FRP ব্লেড। Computer পরিচালিত 34.7 KV Electric Power Generator। বায়ুর প্রবাহ যতই ওঠানামা করুক Steady voltage থাকবে সর্বদাই। বায়ুপ্রবাহের গতি ঘন্টায় 320 কিলোমিটার বেশি হলেই নিজের থেকে ছেড়ে দেবে জেনারেটরকে। Wind Firm থেকে বিদ্যুৎ মুল ভূখন্ডে আনা হল HVDC'র মাধ্যমে। বিদ্যুৎ চাহিদার চেয়ে জোগান অনেকটাই বেড়ে গেল।

চিত্র ছয়

স্থান Spain এর Munica, পৃথিবীতে প্রথম Solar Thermal Power Plant, ক্ষমতা 1.4 মেগাওয়াট। 18,000 বর্গমিটার Solar Concentrator। মাঝে 2 টা 800 মিটার লম্বা টিউবের মধ্যে জলকে 240°C তাপমাত্রায় বাষ্প করে টারবাইন চালাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। পৌঁছে যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য (Middle East), উত্তর আফ্রিকার 60 শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তথ্যটা জার্মান এরোস্পেসের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল (Source : Novetee Biosol)। প্রায় 3.5 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার রাজস্থানের মরু অঞ্চল। যদি অর্ধেকটা জুড়ে Solar Thermal Power Plant বসানো যায়, উৎপাদন ক্ষমতা হবে 13,300 গিগাওয়াট। পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা কী আর থাকবে?

চিত্র সাত

2003 সালে নরওয়ের Kvalsund'র নিকট সমুদ্রের 50 মিটার গভীরে পৃথিবীতে প্রথম সমুদ্রের জোয়ার ভাটার স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে 300 KW এর একটা Tidal Current Turbine বসানোর কাজ শুরু হয়। 120 টন ওজনের জলমগ্ন টাওয়ার, 200 টন ওজনের পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে। 10 মিটার লম্বা লম্বা তিনটি FRP Blade ইলেকট্রিক জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি সেকেন্ডে চার মিটার জলের গতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

করতে সক্ষম। একাজে যুক্ত ছিল পৃথিবীর বহু নামি দামি সংস্থা। যেমন -Hammerfest strom, ABB, Rolls - Royce, Skelmer Skanika, SINTEE Energy Research, Staloilanel Venturos। 2004 সাল অবধি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উৎপন্ন বিদ্যুৎকে National Grid'র সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং বছরে 700 MWh বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। টারবাইন ডিজাইন করার সময় আয়ু ধরা হয়েছিল তিন বছরের, তবুও কোন প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই চার বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পরবর্তীকালে প্রতিটি সংস্থাই Tidal Current Turbine উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপিয়ান মেরিন এনার্জী সেন্টার (EMEC)। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গভীরতা পঁচিশ মিটার থেকে পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত ওঠানামা করানো হয়েছে। প্রতিটি Power Generationএর ক্ষমতা 1 মেগাওয়াট পর্যন্ত করা গেছে।

এবং ভারতচিত্র

গুজরাটের ''কচ্ছে'', এশিয়ার প্রথম জোয়ার ভাটা থেকে বিদ্যুৎ (Tidal Power Plant) বসানো চলেছে। ক্ষমতা 50 মেগাওয়াট। আগামী দিনে আরও 250 মেগাওয়াট বসানো হবে। প্রকল্পটা Atlantic ও গুজরাট পাওয়ার করপোরেশন যৌথ উদ্যোগ। একইসঙ্গে গোটা গুজরাটের সমুদ্র উপকুল ও গভীর সমুদ্রের বায়ুর মানচিত্রও তারা যৌথভাবেই করছেন।

গাড়ি, বাস চলে তেল বা গ্যাস দিয়ে। শক্তির ব্যবহার 50 শতাংশই তেল বা গ্যাস। আগামী দিনে আরও বাড়বে। অনুমান 2015 সালে আমাদের ক্রুড অয়েলের চাহিদা হবে 4.25 থেকে 4.5 মিলিয়ন ব্যারেল, এর 80 শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে।

ভারতের পণ্য-পরিবহনের 60 শতাংশ এবং জন-পরিবহনের 87.4 শতাংশ ভার বহন করে জাতীয় রাজপথ থেকে গ্রামের মেঠো পথ। দৈর্ঘ্য পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানে, 33,18,000 কিমি। যদিও 6 শতাংশ (70,548 কিমি জাতীয় রাজপথ এবং 1,28,000 কিমি রাজ্য রাজপথ) পথের উপরই 40 শতাংশ পরিবহনের চাপ, দুর্ঘটনাও ঘটে সবচেয়ে বেশি প্রায় 60 শতাংশ। একই সঙ্গে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা, বাড়ছে দূষণ, বাড়ছে দুর্ঘটনা। 2009 সালেই পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, 1,26,896 জন (1,08,490 জন পুরুষ, 18,487 জন মহিলা)। তার মধ্যে 40.2% পথচারী বা সাইকেল আরোহী। শুধু মৃত্যুই নয়, পরিবহনের ধোঁয়া ও গ্যাস থেকে সৃষ্টি হয় অনেক ধরণের মারণ রোগের। এ মারণ রোগের হাত থেকে মানুষ বাঁচতে পারত যদি সব ধরণের রাস্তার দুধারে লাগান হত গাছ। গাছ শুধু যে কার্বন ডাই অক্সাইডকেই শোষণ করে নেয় তাই নয়, সৃষ্টি করবে প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন, প্রচুর পরিমাণে জৈব জ্বালানি। এক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ইউক্যালিপ্‌টাস, বাবুল, ক্যাসিওরিনা জাতীয় গাছ লাগালে এক মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট সারা বছর ধরেই চলবে। করঞ্জা, মহুয়া, কুসুম, নিম, রেড়ি ইত্যাদি জাতীয় গাছ লাগিয়ে পাওয়া যাবে পথ পরিবহনের জ্বালানি বায়োডিজেল। সঙ্গে পাওয়া যাবে প্রায় তিন গুণ ওজনের খইল (Oil Cake)। উৎপন্ন হবে বায়ো গ্যাস, জৈব সার। বায়োগ্যাস দিয়ে এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা মিটবে। চাষে জৈবসার ব্যবহার হলে, রাসায়নিক সারের উগ্র দাপটের হাত থেকে চাষিরা বাঁচবে। গ্রামের বিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁচিয়ে তুলবে গ্রামীন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে। সৃষ্টি করবে অসংখ্য কর্মদিবস। পাল্টে যাবে গ্রামীন অর্থনীতি। হয়ত হয়ে উঠবে মহাত্মা গান্ধীর ''গ্রামীন ভারত''।

রিনিউএবল ফুয়েল অ্যাসোসিয়েশন-এর তথ্য অনুসারে গোটা বিশ্বে ইথানল জ্বালানীর উৎপাদন 40.52 বিলিয়ন লিটার। তার সিংহভাগই আমেরিকা, 18.3 বিলিয়ন লিটার। তার পরের স্থানে ব্রাজিল, 17.5 বিলিয়ন লিটার, দেশের জ্বালানির অধিকাংশটাই সৃষ্টি করেছে। 70-80 শতাংশ ইথানল চালিত গাড়ি। অথচ আমরা 10 শতাংশ জ্বালানির সঙ্গে মিশ্রনের ভাবনা পূরণ করতে পারছি না, কেন না উৎপাদন মাত্র 0.2 বিলিয়ন লিটার।

1998-99 সালে বাঙ্গালোরের ''ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ সায়েন্স'' একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, 154 মিলিয়ন হেক্টরে উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করার পর অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে তার পরিমাণ 515 মিলিয়ন টন। সবটাই সংগ্রহ করা অর্থনীতিভাবে সম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভব 378 মিলিয়ন টন সংগ্রহ করা, যা ব্যবহার করে উৎপন্ন করা যায় প্রডিউসার গ্যাস। চলবে 16,101 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যদিও এই সমীক্ষায় বাদ দেওয়া হয়েছিল ছোট 200 কিলো ওয়াটের নীচের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে। এ ধরনের ছোট ছোট গ্রাম বা নগর ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে বিদ্যুৎ পরিবহনের অপচয় হবে না। কমবে ডিজেল

জেনেরেটরের ব্যবহার। কর্মসংস্থান হবে বহুমানুষের। সরকারী তথ্য-বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা 19,500 মেগাওয়াট, ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র 2,675 মেগাওয়াট। বাকীটা অপচয় করা হচ্ছে। বিদেশী পারমানবিক চুল্লির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 20,000 মেগাওয়াট। যদি 100 শতাংশ উৎপাদন করতে পারে তা পরিবহনের পর পাওয়া যাবে 12,000 মেগাওয়াট। খরচ 2,61,480 কোটি টাকা। এর অর্ধেক টাকা খরচ করলে 16,825 মেগাওয়াট বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। আঞ্চলিক উৎপাদন, পরিবহন ও বন্টনের অপচয় নামমাত্র। প্রায় 16,000 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। পরিকল্পনাটা যতই বাস্তব হোক না কেন "ভারত সরকার" এ কাজ করবে না। এ কাজ করলে বিদেশী ঋণ নেওয়া যাবে না। যুগ যুগ ধরে সুদও দেওয়া যাবে না। বৃহৎ শিল্পের প্রবক্তা ভারত সরকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্পে মানসিক শান্তি পায় না।

"পতিত ও অনাবাদি জমিকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করুন"। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে এ আবেদন করেছিলেন ভারতের বায়ো ডিজেল উৎপাদনকারীদের সংগঠন। আরও বলেছিলেন "পতিত অনাবাদী জমিতে Jatropha জাতীয় গাছ লাগাতে দিন। দৈনিক এক মিলিয়ন লিটার বায়োডিজেল তৈরী হবে। কর্মসংস্থান হবে দশ লক্ষ মানুষের। তৎসহ বিদেশ থেকে তেল আমদানিও কমানো যাবে। খরচ কমবে বিদেশী মুদ্রার, বায়োডিজেল থেকে যতটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হবে তার বেশি CO_2 গাছগুলো বেঁচে থাকতে বাতাস থেকে নেবে, সঙ্গে উৎপন্ন করবে আমাদের বাঁচার জন্য প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন। পরিবেশ দুষণ তো হবেই না। বরং Carbon Credit থেকে বিদেশী মুদ্রা রোজগার করা যাবে। বায়োডিজেল উৎপাদন করলে প্রায় তিনগুণ খইল (Oil Cake) উৎপাদন হবে। Jatropha বিষাক্ত তাই পচিয়ে বায়োগ্যাস তৈরী করা গেলেও জৈবসার তৈরী করা যাবে না। কিন্তু সরাসরি জ্বালিয়ে প্রচুর পরিমানে গ্যাস উৎপাদন করা যায়। যা দিয়ে চলতে পারে ছোট ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র। এক মিলিয়ন লিটার বায়োডিজেল উৎপাদন করতে গেলে পাওয়া যাবে প্রায় 3000 টন খইল (Oil Cake) যা 1.237 মিলিয়ন লিটার ডিজেলের সমান তাপ সৃষ্টি করবে। (Calorific value of Jatropha 18.2 MJ/Kg. & Diesel 44.13 MJ/Kg.)। ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয়ের 1970-71 সালের তথ্য অনুযায়ী পতিত জমির পরিমাণ দুই মিলিয়ন হেক্টর (6.6%), অনুর্বর চাষের অযোগ্য জমি, 3 মিলিয়ন হেক্টর (9.9%),অন্যান্য চাষের অযোগ্য জমির পরিমান 3.25 মিলিয়ন হেক্টর (10.6%), এ তথ্য থেকে অনাবাদী পতিত জমির পরিমাণটা উঠে এসেছে। তবুও প্রধানমন্ত্রীজি বা তাঁর দপ্তর এ ডাকে সাড়া তো দেনই নি, এমনকি প্রাপ্তি স্বীকারও করেননি আবেদন পত্রের। যদি সমস্ত পতিত অনাবাদী জমি বায়োডিজেল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় তবে দৈনিক উৎপাদন করা যাবে 4 মিলিয়ন লিটারের বেশি বায়োডিজেল। 74,250 টন খইল যা প্রায় 30 মিলিয়ন লিটার ডিজেলের সমান। ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে পারত লক্ষাধিক।

বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি নিজের জীবনযাত্রা দিয়ে উদাহরণ রেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের ভারতের। সুট বুট খুলে ফেলে প্রত্যন্ত গ্রামের গরীব মানুষের আটহাতি ধুতিকেই সম্বল করে হেঁটেছেন কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারী। নিজের জীবনযাত্রা দিয়েই মানুষের অন্তরে পৌঁছে গেছেন। চরকায় সুতো কেটে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, ঠিক যখন মহারাষ্ট্র গুজরাটে যন্ত্র চালিত বস্ত্র শিল্পের রমরমা। তাঁর স্বপ্নের ভারতে অগ্রাধিকার ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের, পরিবহনের জন্য শকট যান, চাষ আবাদে ছিল না কোন যন্ত্রের প্রবেশাধিকার, কায়িক শ্রমকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। রাজনীতির উর্ধ্বে সহজ সরল জীবনযাত্রা দিয়ে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন সমান অধিকার। অহিংসা দিয়েই মিটিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে। দেখাতে চেয়েছিলেন কোন সম্প্রদায়ের ভারত নয়, ধনী জমিদার, জোতদার, রাজা, মহারাজাদের ভারত নয়। ভারতবাসীর ভারত। সবার ভারত। সেপথে ভারত সরকার হাঁটলে প্রয়োজন হত না এত বিদ্যুৎ, সৃষ্টি হত না এত অর্থনৈতিক বৈষম্য, সবার জন্য থাকত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্যই স্বাস্থ্য। দারিদ্রসীমার নীচে শব্দটা থাকত মাত্র অভিধানে।

বিশেষ আলোচনা

ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি ঃ সাম্প্রতিক হালচাল

অনন্তরামন শ্রীনিবাস ও সঞ্জয় মিত্র

[2011 ই এফ সুমাকার -এর জন্ম শতবর্ষ। কেরালা ও অন্যত্র কিছু প্রগতিশীল সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর মত ও আদর্শ নিয়ে কিছু আলোচনাচক্র আয়োজন করা হয়েছে। সুমাকার তাঁর 'স্মল ইজ বিউটিফুল' বইতে নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও শঙ্কার কথা বলেছেন। সারা পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীদের কাছে তিনি সবসময় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। এ বছর আমরা শ্যালমীদি (খাস্তগির) -কে হারলাম। যিনি তার ফিল্‌ম ও অন্যান্য নথিপত্র দিয়ে যদুগোড়া ইউরোনিয়াম খনির প্রভাবে স্থানীয় মানুষের ক্ষতির কথা (মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ সহ) তুলে ধরেছেন। এই লেখাটি এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হল (লেখক দ্বয়)]

ভারতের মূল ধারার কুলীন সংবাদ মাধ্যমগুলো নিউক্লিয়ার শক্তির সপক্ষে জোর সওয়াল শুরু করে দিয়েছে। 2011 সালে মার্চ মাসে ঘটে যাওয়া ফুকুসিমার বিপর্যয় তাদের দমাতে পারেনি। তারা দলবেঁধে তড়িঘড়ি ঘোষনা করে দিয়েছে যে ভারতে এমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। ভারতের নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি নিরাপদ।

সকলেই জানেন তথাকথিত 'কার্বন নিঃসরণ মুক্ত' নিউক্লিয়ার শক্তিকে পরিবেশ পরিবর্তনের সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়। বলা হচ্ছে ভারত তার 'অগ্রগতি'র জন্য নিউক্লিয়ার শক্তির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য, কারণ কয়লা ও তেলের জোগান কমে আসছে আর দামও বেড়ে চলেছে। এই প্রশ্নটা কেউ তুলছেনা যে, এই ধরনের অগ্রগতি কি আমাদের সত্যিই প্রয়োজন যেখানে লক্ষ কোটি মানুষ বাইরেই থেকে যায় আর বেড়ে চলে সামাজিক অসাম্য? নাকি আমরা অগ্রগতির অপেক্ষাকৃত কম হারকেই চাইবো যা সকলের জন্য অর্থবহ কর্মসংস্থান দিতে পারে?

ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি পরিকল্পনা সমূহঃ

ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তির বাস্তব ছবিটা কেমন? দি হিন্দু বিজনেসলাইন (2 নভেম্বর 2011) - পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ জানাচ্ছে যে ভারতে উৎপাদিত শক্তির মাত্র 2 শতাংশ নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত শক্তি। যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা 4780 মেগাওয়াট। ভারতের পারমানবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ চান 2020 সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা 20,000 মেগাওয়াট নিয়ে যেতে।

অক্টোবর 2011 তেও যদি ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা হয় 4780 মেগাওয়াট তবে বলতেই হয় 2020 সালের মধ্যে তা 20,000মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটাই আকাশ কুসুম কল্পনা। উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে "কেন্দ্র সরকার নীতিগতভাবে 5টি নতুন বৃহদাকার প্রকল্পস্থল (Green field site) ঠিক করেছেন যেগুলি হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (NPCIL) 700 মেগাওয়াটের (দেশী) ও 1000 মেগাওয়াটের (বিদেশী) আমদানীকৃত বড় চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদেশী চুল্লি গুলোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি.ই. এবং ওয়েষ্টিং হাউস, ফ্রান্সের অ্যারেভা কোম্পানির সঙ্গে কথা চালাচ্ছে। রাশিয়ানরা কুদানকুলামে দুটি 1000 মেগাওয়াটের চুল্লি বানিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবাদ ঃ যদুগোড়ার অভিজ্ঞতা ঃ সাম্প্রতিক কুদান কুলাম

গত মে মাসে ইউরেনিয়াম করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া (UCIL) যদুগোড়ায় 'জন শুনানি' আয়োজন করেছিল। একটা প্রহসন মাত্র - কারণ আন্দোলনকারী থেকে সাধারণ মানুষ কাউকেই তাতে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কথা ছিল স্থানীয় একটা খেলার মাঠে হবে জন শুনানী। হঠাৎ তা UCILএর চৌহদ্দির মধ্যে আয়োজন করা হল। সাংবাদিকরাও ঢুকতে পারলেন না - মহিলারা পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁরা কারা? দৃশ্যতই UCIL-এর কর্মী অথবা কর্মীদের গৃহিনীগন। তাঁরা যে শাড়ি পড়ে ছিলেন সম্ভবত তাও UCIL-এর দেওয়া।

কোনও শুনানি হল না সেখানে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের কর্মীরা সেই স্থান ত্যাগ করলেন গাড়ি চেপে - সোজা UCILএর অতিথি নিবাসে। সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাব তারা দিলেন না। এভাবেই UCIL প্রতিবাদীদের দলে টেনে নিয়ে প্রতিবাদকে দমিয়ে দিয়েছে। সংস্থার স্থায়ী কর্মীদের মাসিক বেতন পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। সুতরাং তারা চাকরি যাবার ঝুঁকি নিতে পারেন না কোনও কারনেই। এমন একটা পরিবেশ, যেখানে জীবন সংস্থানই অনিশ্চিত, সেখানে তেজস্ক্রিয়তার জন্য ভবিষ্যতে কী হবে, তা ভাবার মত কেউ থাকে না।

কুদানকুলামেও রিয়াক্টার বসানোর বিরুদ্ধে চলতে থাকা মৎসজীবীদের প্রতিবাদ আন্দোলনও প্রচারমাধ্যমের বিরুপ সমালোচনার শিকার হচ্ছে। সরকারি ব্যক্তব্যকে তোতা পাখির মত আউড়ে তারা বলছে এই আন্দোলন নাকি বিদেশী চক্রান্তের ফসল। নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশনের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস. কে. জৈন বলেছেন ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী গোষ্ঠীগুলো কুদানকুলামে স্থানীয়দের সঙ্গে প্রচার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সরকারি আর ব্যবসায় জগতের লোকেরা যদি মিলতে পারে, তাহলে নাগরিক সমাজের মানুষেরা মিলিত হলে সেইটা এত সন্দেহজনক লাগে কেন?

মতাদর্শের মিলিজুলি ঃ

মতাদর্শের ভিন্নতা সত্বেও নিউক্লিয়ার শক্তির সমর্থনে রাজনৈতিক দলগুলো এককাট্টা। তারা কী যুক্তি দেয় এ ব্যাপারে?

প্রথমে প্রধান বামপন্থী দলের কথা ধরা যাক। তারা এর সমর্থনে বলে থাকেন এমন টা - আমাদের আত্মনির্ভর নিউক্লিয়ার শক্তি প্রকল্প চাই। এ জন্য আমাদের দেশের নিজস্ব নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি আছে, এমন কি প্রাকৃতিক উপাদানও বর্তমান। ভারতে রয়েছে অনেক ইউরেনিয়াম খনি যা এখনও খনন করা হয়নি। তাছাড়া রয়েছে রাশিয়ার মত 'বন্ধু' দেশ, যারা সাহায্য করতে পারে ভারতকে। এ ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার সাহায্য নেওয়া উচিত নয় কারন অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার তাঁবে থাকা দেশ। দক্ষিণপন্থী দলগুলিরও মূলগত আপত্তি নেই এ ব্যাপারে। তবে তারা আমেরিকার সাহায্য পেলে বেশি আশ্বস্ত বোধ করেন। তাঁদের কাছে চিন বিপদজনক, আমেরিকা নয়।

কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তি প্রকল্প স্থাপনের বিরোধী আন্দোলনরত মানুষের কণ্ঠস্বর অস্বীকার করতে দু' তরফই সমান তৎপর। তা সেটা যদুগোড়া হোক বা কুদানকুলাম। কুদানকুলাম আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে দু পক্ষই তৎপর। দক্ষিণপন্থীরা বলছে চার্চ ও পশ্চিমী দুনিয়ার মদতে চলছে এই আন্দোলন যাতে ভারত নিজস্ব নিউক্লিয়ার প্রকল্প গড়ে তুলতে না পারে। বামেরাও একই কথা বলছে। এই আন্দোলনের পেছনে চক্রান্ত রয়েছে বিদেশী শক্তি আর চার্চ থেকে আর্থিক মদত পাওয়া NGOদের।

নিউক্লিয়ার শক্তি প্রকল্প যদি এমনই সুরক্ষিত, দুর্ঘটনার সম্ভাবনাহীন, দূষণমুক্ত প্রকল্প হয়ে থাকে, তবে এই ডান বাম মতাদর্শের প্রবক্তরা ঐ প্রকল্প গুলো শহরে বসাচ্ছেন না কেন, যেখানে তারা বাস করেন? তারা যদি জাইতাপুর বা কুদানকুলামের বাসিন্দা হতেন তা হলেও কি এমনটা বলতে পারতেন? তাদের মত অনুসারে জাইতাপুর, কুদানকুলাম বা যদুগোড়ার মানুষের ভীত হবার ও আশঙ্কা প্রকাশের অধিকার নেই।

শক্তি ব্যবহার ঃ অসাম্যের চিত্রপট ঃ

দেশে প্রয়োজন এর তাগিদে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কি একান্তই আবশ্যিক? 'দেশ' নামক একটা বিমূর্ত ধারনার অবতারনা করার ঐতিহ্য বাদ দিলেও, এ ব্যাপারে বুঝে নিতে হবে দেশের চাহিদা বলতে কী ঠিক বোঝানো হচ্ছে। কাদের চাহিদা? এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সব গৃহস্থালীতে বিদ্যুৎ পৌঁছয় না, অথচ সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপদের মধ্যে ফেলে এমন ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে যাতে কিছু মানুষের সুখের জন্য এয়ার কন্ডিশনার বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালান যায়। নতুন নিউক্লিয়ার প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা জলাধার বানানোর আগে শক্তি ব্যবহারের এই অসাম্যের দিকটায় নজর দেওয়া দরকার।

আর একটা বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার। মজার কথা কয়লা বা তেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ শহরে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় আর সৌর বিদ্যুৎ, যা মাত্র শৈশব অবস্থায়, তা পড়ে থাকছে গ্রামীন ভারতের জন্য। 'প্রয়াস'-এর গিরিশ সন্তের দাবির সমর্থনে বলা যায়, ব্যবস্থাটা উল্টো হওয়া উচিত। কয়লা ব্যবহৃত হোক গরীব মানুষের ঘরে আলো জ্বালানোর জন্য। তাতে অপব্যয় কম হবে। শহরে বড়লোকেরা বরং বেশি দাম দিয়ে ফোটোভোল্টাইক সেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কিনুক। তারা বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনলে, বিদ্যুতের অপচয়ও কম হবে।

এখনও বাকি যে কাজ ঃ

নিউক্লিয়ার শক্তিবিরোধীদের ভারতের শক্তি রাজনীতির বিষয়গুলোয় আলোকপাত করা উচিত। শ্যামলী দি যেমন করেছিলেন। যদুগোড়ায় জনসাধারনের জীবন এবং তাদের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে তিনি সমীক্ষা চালিয়েছেন। এই এলাকায় খোলা লরিতে এখনও ইউরোনিয়াম নিয়ে যাওয়া হয়। UCILপুরো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলেছে। নিউক্লিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচারকে চ্যালেঞ্জ জানানো জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ আগামী দিনে এই প্রোপাগান্ডা আরও তীব্র আকার নেবে।

সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ ঃ শুভ্রব্রত নিয়োগী

বিশেষ নিবন্ধ

ভূ-উষ্ণায়ন ও হকি স্টিক বিতর্ক

কুমারেশ মিত্র

qumareshnitra@gmail.com

[ভূ-উষ্ণায়ন তথা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার বিজ্ঞানভিত্তি এখনও প্রশ্নতীত নয়। ভূ-উষ্ণায়নের জন্য উন্নত দেশগুলিই মূলত দায়ী - এই অভিযোগ থেকে দৃষ্টি সরাতেই কি তার মূলে টান পড়ছে? এমন সন্দেহের অবকাশ থাকে। বিশেষত আরও এই কারণে ভূ-উষ্ণায়নের বিজ্ঞানভিত্তি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা কোন একক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানগোষ্ঠী বা এমনকি দেশের পক্ষেও প্রায় দুঃসাধ্য। অথচ, বিষয়টা আমাদের মত দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাতেও ছায়া ফেলেছে। তাই তর্কটাও হয়তো উপেক্ষা করা যায় না। কুমারেশ মিত্র হদিশ দিয়েছেন বিতর্কটির। সঃমঃ]

পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে মোটমুটি একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে ভূ-উষ্ণায়ন অনেকাংশে বাতাসে মনুষ্য-সৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাস, মূলতঃ শিল্প-জাত CO_2 গ্যাসের নি:সরণের দরুণ ঘটেছে। আবার বিজ্ঞানীদের একটি শক্তিশালী শিবির আছে যাঁরা মনে করেন, মানুষ-নিরপেক্ষভাবে প্রাকৃতিক চক্র ও শক্তি ভূ-উষ্ণায়ন ঘটিয়েছে। ভূ-উষ্ণায়ন বিতর্ক ও হকি স্টিক লেখচিত্র ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। বহু বিতর্কিত এই হকি স্টিক লেখচিত্রে ম্যান্ প্রমুখের লেখা নেচার প্রত্রিকায় প্রকাশিত গত এক হাজার বছর সময়ের সাথে পৃথিবীর উষ্ণতা পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।[1] এই লেখচিত্রটি হাজার বছরের অধিকাংশ সময় (প্রায় নশ' বছর) জুড়েই ভূ-উষ্ণতায় অসংখ্য স্বল্প সময়ের ছোট ছোট ওঠানামা (fluctuations) সহ একটি হকি স্টিকের অনুভূমিক লম্বা হ্যাণ্ডেলের মত প্রায় নতিহীন বা সামান্য নিম্নগামী রেখা নির্দেশ করেছে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রায় হকি স্টিকের ব্লেডের মত উষ্ণতার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। ম্যান্ ও অন্যান্যদের এই গবেষণা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত জলবায়ু সংক্রান্ত সংগঠন 'ইন্টার গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট্ চেঞ্জ (আই পি সি সি) তার ২০০১ সালের প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করে। ১৮৫০ সাল উত্তর শিল্প বিপ্লবের যুগে, বিশেষত: বিংশ শতাব্দীতে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) দহনে বাতাসে CO_2-এর বিশাল পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে গেছে (গত শতাব্দীতে ২৮০ থেকে প্রায় ৩৮০ পি পি এম ভি অর্থাৎ ১০০ পি পি এম ভি, যেখানে পি পি এম ভি-র অর্থ হল, পার্টস্ পার মিলিয়ন আয়তন অনুযায়ী)। ফলে আই পি সি সি প্রতিবেদনে প্রকাশিত ম্যান্ লেখচিত্র ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা CO_2-কৃত গ্রিন হাউস প্রভাবের দরুণ উত্তাপ সৃষ্টিকে মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ হিসাবে হাজির করেছেন।

ম্যান্ প্রমুখের তথ্য সমষ্টি (data set) ও গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে ওদের গবেষণার কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানী ম্যাকিনটায়ার ও ম্যাকির্তিক।[2] ওঁরা দেখান, ম্যান্ প্রমুখ তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিলেন ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, ভুল গণনা এবং পক্ষাপাতদুষ্ট আবহাওয়া রেকর্ড নির্বাচনের ভিত্তিতে। ম্যান প্রমুখের ভুলগুলি ছিল ঃ কিছু পরিমাপ সঠিক বছরের বদলে ভুল বছরে নির্দেশ করা, বিভিন্ন বছরে প্রক্সি তথ্য হিসাবে একই সংখ্যা বার বার নেওয়া, বাজেয়াপ্ত তথ্যগুলিকে সংশোধন করে গ্রহণ করা। ওঁরা মধ্য ইংল্যাণ্ডের উষ্ণতা শ্রেণীকে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ১৭৩০ সালেই কেটে দেন, যদিও ১৬৫৯ সাল অবধি তথ্য ছিল। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল পাঁচ শতক ব্যপী ক্ষুদ্র তুষার যুগের শীতল সপ্তদশ শতাব্দীর সময়টাকে আড়াল করা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পৃথিবী ক্ষুদ্র তুষার যুগের অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসে এবং সূর্য অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে পড়ে। সূর্যের কারণে ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্বকে ঢাকা দিতে ম্যান প্রমুখের গবেষণা একটি বিকৃত চেষ্টা বলেই কেউ কেউ মনে করেন। বিশেষত : ম্যাকিনটায়ার এবং ম্যাকির্তিক

গভীর অধ্যাবসায়ে ম্যান প্রমুখের সমস্ত ত্রুটি দূর করে দেখান, গত ৬০০ বছরের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী উষ্ণতা বৃদ্ধির নিরিখে কোনো ব্যতিক্রমী শতাব্দী ছিল না। তাঁরা আরও প্রমাণ করেন, ম্যান প্রমুখের গবেষণার ভিত্তিতে আই পি সি সির ২০০১ সালে প্রতিবেদনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি: (১) ১৯৯০-এর দশক "সম্ভাব্য উষ্ণতম দশক" ছিলো এবং (২) এল নিনো বছর ১৯৯৮ সাল ছিলো "গত হাজার বছরের মধ্যে উষ্ণতমন বছর", সম্পূর্ণ ঠিক ছিলো না। গত শতাব্দীর শেষের আই পি সি সির পুরোনো প্রতিবেদনগুলিতে মধ্যযুগের (৯৫০ থেকে ১৩০০ সাল অবধি) ভূ-উষ্ণায়ন নথিবদ্ধ করা আছে। এই উষ্ণায়ন গত নব্বই দশকের উষ্ণায়নের চেয়ে কম ছিলো না।

ম্যাকিনটায়ার এবং ম্যাকির্তিক-এর গবেষণাপত্রটি অঙ্ক শাস্ত্র, রাশি বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, প্যালিও-আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যার নেতৃস্থানীয় দক্ষ বিজ্ঞানীদের দ্বারা রিভিউ করা হয়েছিল। এর পর ছাপার আগে স্বাভাবিক নিয়মে ব্রিটিশ জার্নাল Energy and Environment-এ রিভিউয়ার কর্তৃক 'পিয়ার রিভিউ' করা হয়।

স্বভাবতই এখানে দুটি প্রশ্ন মনে ভিড় করে। ১৯৯৮ সালের ম্যান প্রমুখের পেপারটি এত সাংঘাতিক সব ত্রুটি নিয়েও নেচার পত্রিকার 'পিয়ার রিভিউয়ের' -এর গণ্ডি কি করে অতিক্রম করল? আবার আই পি সি সি তে রিভিউ প্রক্রিয়া মনুষ্যকৃত ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্ব প্রচারে কেন এই ত্রুটিপূর্ণ পেপারটির সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা হয়ে দাড়াল না তা ভাবতে বিস্ময় জাগে। এই সমস্ত কিছু রাষ্ট্র সঙ্ঘ সৃষ্ট আবহাওয়া বিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির বিজ্ঞান অধ্যায়নের নিরিখে করুণ উদাসীন (!) চিত্রটি তুলে ধরে।

বরফ কোর্ রেকর্ড এবং হকি স্টিক চিত্র

শিল্প বিপ্লবের পূর্ব যুগে এমনকি দূর অতীতের ভূতাত্ত্বিক সময়ের পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলকে নতুন করে জানতে বিশেষত: এর উপাদান গ্যাস গুলির ঘনত্ব নির্ণয়ে যে মূল অনুমানটি (basic assumption) নেওয়া হয় তা হল হিমবাহের বরফ অন্দর-মহলে (ice core-এ) বন্দী গ্যাস সমুহ একটি বদ্ধ তন্ত্রের (closed system-এর) ন্যায় ব্যবহার করে এবং এর ফলে গ্যাস সমুহ তাদের একদম প্রারম্ভিক রাসায়নিক ও সমস্থানিক সংযুক্তি চিরকাল বজায়ে রাখে। অবশ্য সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা কর্ম এই সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে ব্রুক্স্ হার্ড (২০০৫) নামে একজন দক্ষ গ্যাস বিশ্লেষক বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, যখন বরফের অন্দমহল এক বিশাল চাপের পরিবর্তনের (প্রায় ৩০০ বার অবধি - স্বাভাবিক বায়ু চাপের ৩০০ গুণের চেয়ে বেশি) মধ্যে থাকে তখন অন্তমুর্খী ব্যাপন (internal diffusion) -এর সঙ্গে কুণ্ডসেন ব্যাপন প্রভাব (Kundscn diffusion effect) বরফ বন্দী CO_2 -এর উপর ক্রিয়া করতে থাকে। এর ফলে সময়ের সঙ্গে CO_2-এর মাত্রার পরিবর্তনের পাল্লা কমে যায় এবং এর সর্বোচ্চ মানও অনেক হ্রাস পায়। তাই বরফ অন্দর থেকে CO_2-এর মাত্রা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল বরফের চাদর ও বরফের অন্দরে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াসমূহ সৃষ্ট বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এবং এর মানগুলি অন্য পদ্ধতিতে পাওয়া বাস্তব ও সত্যিকারের (!) প্রাচীন আবহাওয়া মণ্ডলের মানের চেয়ে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কম বলেই প্রতীয়মান হয়। বস্তুত: এটা কখনও পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো সম্ভব হয় নি যে বরফ অন্দর থেকে উদ্ধার করা তথ্যের রেকর্ড সত্যিকারের আবহাওয়া মণ্ডলের তথ্যাদির সঙ্গে মিলে যায় কিনা। তবু বরফে বন্দী বাতাসের মধ্যে CO_2 গ্যাসের ঘনত্বকে শিল্প-বিপ্লব পূর্ব প্রাচীন বায়ুমণ্ডলের তথ্য হিসাবেই ধরা হয়েছে। তবে এই প্রাচীন বায়ু মণ্ডলীয় তথ্যের মান প্রায়শই বর্তমান বায়ুমণ্ডলীয় মাত্রার চেয়ে প্রায় ১০০ পি পি এম ভি কম হয়।[3,4] তবু বর্তমানের তুলনায় বিগত প্রায় চার লক্ষ বছর জুড়ে অনেক সময় আবহাওয়া অনেক বেশি উষ্ণ ছিল।[5] এমনকি এক লক্ষ ২০ হাজার বছর আগে যখন পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় ৫° সে বেশি ছিলো,[5] তখন হিমবাহের বরফ অন্দর মহলের রেকর্ড থেকে গণনা করা CO_2-এর মাত্রা পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ২৪০ পি পি এম ভি[6] যা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মান থেকে ১৪০ পি পি এম ভি কম। খুব

সাম্প্রতিক কালে হলোসিন যুগে (বর্তমানের তুলনায় ৮০০০ থেকে ১০০০০ বছর আগে) যখন পৃথিবী আবার এখন থেকে ৫° সে উষ্ণতর ছিল বরফ কোরের রেকর্ড থেকে পাওয়া CO_2-এর লেভেল ছিল মাত্র ২৬০ পিপিএমভি। বর্তমান থেকে ১০,০০০ বছর অতীত সময় থেকে শিল্প বিপ্লবের শুরু অবধি সময়ে বরফ কোর রেকর্ডের গণনা করা তথ্য অনুযায়ী বাতাসে CO_2-এর লেভেল ২৬০ থেকে ২৮০ পিপিএমভি-র মধ্যে ঘোরা ফেরা করেছে। ওয়াগনার[7] প্রমুখের গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে বরফ কোর রেকর্ডের এই তথ্যগুলি মেলে না।

নানা ধরণের অনুমানের ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি পৃথিবীর তাপমাত্রার ওঠা নামা নিয়ে অসংখ্য লেখচিত্র আঁকা হয়েছে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে হকি স্টিক লেখচিত্র, কেননা এই শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে হকি স্টিকের বাঁকা ব্লেডের মত ওপর দিকে। আই পিসিসি রিপোর্টে (২০০১) ''সামারি ফর পলিসি মেকারস্'' অধ্যায়ে ১০ হাজার বছরের এবং উল্‌ফ্ (২০০০)-এর গবেষণা কর্মে প্রায় ৪ লক্ষ বছরের তাপমাত্রার ওঠা নামা দেখানো হয়েছে,[8] যেখানে বিভিন্ন সময়ে বায়ুতে CO_2-এর লেভেলও চিত্রিত করা হয়েছে। গত ৪ লক্ষ বছরে বরফ অন্দর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর লেভেল ১৮০ থেকে ২৮০ পিপিএমভি পাল্লার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। অথচ পরিমাপের মাধ্যমে জানা গিয়েছে গত শতাব্দীর শেষে এর মান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ পিপিএমভি। তাই হকি স্টিক লেখচিত্র গুলি কিছুটা অবৈধভাবে বরফ অন্দরের প্রক্সি রেকর্ডের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের পরিমাপ করা উপাত্ত গুলি মিশিয়ে আঁকা হয়েছে। অবশ্য কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় অন্যান্য প্রক্সি পদ্ধতির সাহায্যে দেখিয়েছেন, গত লক্ষ লক্ষ বছরে অনেক সময় বায়ু মণ্ডলে CO_2-এর মাত্রা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বর্তমান সময় থেকে ৭ থেকে ৮ হাজার বছর আগের সময়ের কুমেরুর টেলর ডোমের বরফ নিয়ে দুটি প্রক্সি পদ্ধতির সাহায্যে বায়ুর CO_2-এর মাত্রা নির্নয় করা হয়েছে। বরফ কোর পদ্ধতি অনুযায়ী এর মান ২৬০ থেকে ২৬৪ পিপিএমভি-র ক্ষুদ্র পাল্লায় সীমাবদ্ধ থেকেছে যদিও ওয়াগনার প্রমুখ অন্য একটি পদ্ধতির (fossil leaf stomata indices) সাহায্যে দেখিয়েছেন, এই মান ঐ সময়ে ২৭০ থেকে ৩২৬ পিপিএমভি-র মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। তবুও আইপিসিসি বাতাসে CO_2 লেভেল নিয়ে তার অফিসিয়াল রেকর্ড তৈরী করতে বরফ কোর্ তথ্যই শুধু ব্যবহার করেছে। এই তথ্য নিয়ে আঁকা হকি স্টিক লেখাচিত্রগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল শিল্প বিপ্লব-পূর্ব সময়ে বাতাসে CO_2-এর লেভেল বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল এবং ১৮৫০ সাল থেকে শিল্প বিপ্লবের সময়ে মানুষ্য-সৃষ্ট CO_2 গ্যাসের কারণে অভূতপূর্ব ভূ-উষ্ণায়ন ঘটেছে। তবে মনুষ্যকৃত ভূউষ্ণায়ন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় খুবই খারাপ কাজ হল বরফ অন্দরের উপরি অংশে বন্দী বাতাসের বয়স খুশিমতো পরিবর্তন করে দেওয়া। কুমেরুর সিপ্‌ল্ (siple) থেকে সংগৃহীত বরফের কোরে দেখা যায়, ১৮৯০ সালে বরফ জমা হয়েছিল এবং কোরের মধ্যস্থ CO_2 গ্যাসের মাত্রা ছিল ৩২৮ পিপিএমভি। আবার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মৌনা লোয়া আগ্নেয়গিরির উপরে সংগৃহীত বায়ুতে ৮৩ বছর পরে ১৯৭৩ সালে CO_2-এর মাত্রা পরিমাপ করে একদম একই মান ৩২৮ পিপিএমভি পাওয়া গিয়েছে।[9,10] তাহলে তো মেনে নিতে হয়, শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে এবং গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাতাসে একই মাত্রার CO_2 ছিল! অর্থাৎ গত শতাব্দীর ভূ-উষ্ণায়নে CO_2-এর কোনো ভূমিকা ছিল না!

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এইসব আবহাওয়াবিদ্ গবেষকরা সম্পূর্ণরূপে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুমান করে নিলেন, ১ থেকে ১০ গ্রাম অবধি বরফের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা গ্যাস সমূহের বয়স চারপাশের বরফের চেয়ে ঠিক ৮৩ বছর কম ধরতে হবে। এই অনুমানের পিছনে কোনো রকম পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্য প্রমান ছিল না, এই সিদ্ধান্তের ফলে সিপ্‌ল অঞ্চলের সংশোধিত প্রক্সি তথ্য সমূহ মৌনা লোয়া উপর পরিমাপ করা তথ্য সমূহের সঙ্গে একই লেখচিত্রে খুব মসৃনভাবে মিলে গেলো।[9,10] এইভাবে নিজেদের মত ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী CO_2 হকি স্টিক লেখচিত্রগুলি আইপিসিসি-র প্রতিবেদনে প্রচার করা হল যার মধ্যে ''সামারি ফর্ পলিসি মেকার্স্'' (২০০৭)'' -এর চিত্র নং ৩ ছিল। আসলে উপরি উক্ত

আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষকদের অনুমানটি তখনই করা সম্ভব যখন আগে থেকেই মনুষ্যকৃত ভূ-উষ্ণায়নের তত্ত্বটিকে প্রশ্ন না করেই মেনে হয়। পৃথিবীর সব বড় বড় বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত এই আবহাওয়া সংস্থা আইপিসিসি-র ওপর প্রথম থেকে আস্থা স্থাপন করায় বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ বিজ্ঞানীরা এবং সরকার সমস্ত হকি স্টিক লেখচিত্রকে মেনে নেয়। অবশ্য একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আবার একদল বিজ্ঞানী মনুষ্যকৃত ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বকে প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং একে মেনে নিতে অস্বীকার করে। কেননা এই সব হকি স্টিক চিত্র আঁকতে প্রক্সি তথ্য ও উপাও সমূহে নিয়ে খুবই অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন পুরোনো বরফের উপাত্তের উচ্চতর মান এবং নবীন বরফের নিম্নতর মান খুশিমত বাতিল করা হয়েছে; এর সহজ কারণ, এগুলি মনুষ্য-সৃষ্টি ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। গ্রিন হাউস গ্যাস এবং বিশেষ করে পরিবেশ নিয়ে এই অনুসন্ধান, অধ্যায়নে এই ধরনের অভ্যাস এখন খুব স্বাভাবিক হয়ে দাড়িয়েছে। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়নের সমগ্র তত্ত্বটি —যার বিশাল প্রভাব আছে বিজ্ঞান, রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির উপর —বরফের অন্দর মহল নিয়ে গবেষণা কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে গঠিত যে ফলাফল সম্পর্কে অন্য প্রক্সি পদ্ধতিতে গবেষণা কর্মগুলি খুব বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দু:খের বিষয়, মূল ধারার বিজ্ঞানী সমাজ এই দ্বিতীয় পদ্ধতির গবেষণা সম্পর্কে খুবই উদাসীন, যদিও এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।

২০০১ সালে আইপিসিসি-র প্রতিবেদনের প্রতীক হিসাবে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের জায়গায় ছিলো হকি স্টিক্ লেখচিত্র যার উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীকে জানানো ১৯৯০ দশকের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বিগত হাজার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিলো। তাই এই প্রতিবেদনের হকি স্টিক চিত্র থেকে আইপিসিসি-র আগের প্রতিবেদন গুলিতে নথিবদ্ধ মধ্যযুগের (৯৫০ থেকে ১৩০০ সাল) ভূ-উষ্ণায়নে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। হকি স্টিক চিত্রে এই প্রতারণা অন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত সুন ও বেলিয়ানাস (২০০৩) তাদের গবেষণাপত্রে সুচারুভাবে নথিভূক্ত করেছেন Climate Research পত্রিকায়। এর ফলে পত্রিকার যে ছ'জন সম্পাদক কাজটি পত্রিকায় ছাপানোর সাহস দেখিয়েছিলেন প্রকাশক তাঁদের বরখাস্ত করেন। আবার ২০০৭ সালের প্রতিবেদনে ''সামারি ফর্ পলিসিমেকার্স্'' অধ্যায়ে আইপিসিসি তার হাজার বছরের মূল হকিস্টিক চিত্রটি ১৫০ বছরের দৈর্ঘ্যে ছোট করে ফেলে যার শুরুটা ছিলো ১৮৫০ সাল। ঠিক এই সময় থেকেই পৃথিবী ৫০০ বছর দীর্ঘ ক্ষুদ্র তুষার যুগের আবরণ থেকে প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় প্রাকৃতিক নিয়মে বেরিয়ে আসতে শুরু করে; সূর্যের বিকিরণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বর্তমানের তুলনায় শিল্প-নি:সৃত CO_2-এর পরিমাণ এই সময়ে ছিলো নগণ্য। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল অবধি বাতাসে CO_2 নি:সরণ ৫ গুণ বেড়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর তাপমাত্রা সবচেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছিল ০.৫° সে, আবার উষ্ণ চল্লিশের দশক থেকে ১৯৭৫ সাল অবধি তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছিল ০.২° থেকে ০.৩° সে যদিও বাতাসে কার্বন নি:সরণের পরিমাণ ৩ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি দীর্ঘ ৩৫ বছরে যানবাহন ও শক্তিক্ষেত্র থেকে বাতাসে কার্বন নি:সরণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে আরও দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কার্বন নি:সরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়েছে। তাই ২০০৭ সালের চতুর্থ প্রতিবেদনের ''সামারি ফর্ পলিসি মেকার্স্'' অধ্যায়ে আইপিসিসি পৃথিবীর সব সরকার, উৎসাহী বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষকে বার্তা দেয় — বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরিলক্ষিত ভূ-উষ্ণাতার গড় বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই খুব সম্ভবত:, বাতাসে মূলত: জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে মনুষ্য-সৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণেই ঘটেছে। আইপিসিসি 'খুব সম্ভবত': শব্দ যুগল দিয়ে শতকরা ৯০-এর বেশি সম্ভাবনা নির্দেশ করে। আইপিসিসির বিরোধী মতাবলম্বী বিজ্ঞানীরা পক্ষান্তরে মনে করেন, পৃথিবী প্রকৃতিক চক্র ও প্রাকৃতিক কারণেই ৫০০ বছর দীর্ঘ ক্ষুদ্র তুষার যুগের জোয়াল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিগত ৮০০০ বছরের অনেক আগের সময় থেকেই গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সূর্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল

গত শতাব্দীর শেষ ৫০ বছরে, যখন সমগ্র শতাব্দী জুড়ে ভূ-উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাপ ছিল ০.৬° সে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সোলাঙ্কি ও তাঁর সহকর্মীরা (২০০৪) তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে সূর্যই ভূ-উষ্ণায়নের সবচেয়ে প্রভাবশালী কারণ ছিল।[11]

উপসংহার ঃ

পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ শিল্প সমৃদ্ধ দেশের সায়েন্স একাডেমি এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান সংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৈরী আইপিসিসি-র মনুষ্য সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্ব মেনে নিয়েছে। আমেরিকা ছাড়া প্রায় সব দেশই বাতাসে CO_2 সহ গ্রিন হাউস গ্যাস নি:সরণ হ্রাসের কিয়োটো চুক্তি সরকারিভাবে অনুমোদন করেছে। তবে অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশই চুক্তি অনুযায়ী বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস CO_2 হ্রাস করতে শুধু অস্বীকারই করে নি, কার্যত: এই নি:সরণ বাড়িয়েই চলেছে। আইপসিসি নিজে কোনো বিজ্ঞান গবেষণা পরিচালনা করে না, বড় বড় প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ পড়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিষয়ে বিরোধী মতাবলম্বীদের অভিমত হল, আইপিসিসি খুবই পক্ষপাত-দুষ্ট, কেবলমাত্র সেই সব গবেষণা বিবেচনা করে যেগুলি মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এই তত্ত্ব-বিরোধী কোনো ভালো গবেষণা কর্ম প্রতিষ্ঠিত জার্নালে ছাপানো খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উইসকনসিন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমিরিটাস্ প্রখ্যাত আবহাওয়া বিজ্ঞানী রিড্ ব্রাইসন্ (২০০৭ সালে মারা যান) বলেছিলেন, যদি গবেষণার উদ্দেশ্য হয় মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়নের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করা, তাহলে সরকারি কোষাগার থেকে অনেক অর্থের সংস্থান সহজেই করা যাবে, অন্যথায় নয়। তবু মনুষ্য-সৃষ্ট নাকি মানুষ-নিরপেক্ষ ভূ-উষ্ণায়নের দুটি বিপরীত তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। এই দুই শিবিরেই কম বেশি অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আছেন এমন কি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাও আছেন দুদিকে। এই দুই দলের মধ্যে প্রথমটিতে মনুষ্য সৃষ্ট উষ্ণায়নে) পাল্লাটা কিছুটা ভারি। তবে এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াস গড়ে উঠছে না।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Mann et al. 1998, Nature, Vol. 392, pp. 779 - 787.
2. Macintyres and Mckirtic R, 2003, "Energy & Environment, Vol. 14, No. 6 pp. 751-771.
3. Indermuhle, A et al, 1999, Nature, Vol. 398 p. 121 - 126.
4. Petit J.R. et al, 1999, Nature, Vol. 399 (3 June) pp. 429 - 436.
5. Anderson, K.K.et al. 2004, Nature, Vol. 431, pp. 147 - 151.
6. Indermuhle, A et al, 2000, GRL, Vol. 27, pp. 735 - 738.
7. Wagner, F. et al., 1999. Science, Vol. 284, pp. 1971 - 1973
8. Wolf, E. 2003. http ://www.geolsoc.org, uk/ template. cfm? name=geoeventsabstracts & eventId = P620 & abstractId = cwcc_ab7&abstract Type = ext.
9. Friedly, H. et al., 1986, Nature Vol. 324, pp. 237 - 238.
10. Neftel A. et al., 1985, Nature, Vol. 315, pp. 45-47
11. Solanki S.K. et al., 2004. Nature, Vol. 431, pp. 1084 - 1087.
12. www.21stcenturyscience.com/Articles2007/ 20_1_2_co2_scandal.pdf

বিশেষ নিবন্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ঃ একটি প্রস্তাবনা

মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

(mnmkv349@hotmail.com)

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধ আছেন যে এদেশে রসায়ন বিজ্ঞান প্রায় নাই বললেই চলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রসারে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম যে প্রতিষ্ঠা এদেশে হয়েছিল তা কলকাতাতেই হয়েছিল এবং তার চমৎকার বিকাশ ও অগ্রগতি দীর্ঘ দিন চলেছিল প্রায় ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত। আজ রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণা দুর্দশাগ্রস্ত। রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, রাসায়নিক দূষণ আতঙ্ক, সর্বোপরি কর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির অবক্ষয় প্রভৃতির দরুণ 'কেমিস্ট্রি' আজ 'হিস্ট্রি' হয়ে যাচ্ছে। আর প্রকৃতির সত্যানুসন্ধানে বা জীবিকার্জনে রসায়নের সফল সার্থক প্রয়োগ এদেশে হচ্ছেই না প্রায়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ক্ষেত্রে। বড় উদ্যোগপতিরা প্রযুক্তি আমদানি করাই সুবিধাজনক মনে করেন। আর যে সব শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অর্থের অভাব নেই সেখানে পুরাতন হতাবশিষ্ট রাসায়নিক প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক বহুমূল্য আমদানী করা "ম্যাজিক বাক্সসমূহ"-এর, যা থেকে পাওয়া তথ্য ও পরিমাপ সমূহের শুদ্ধতা ও নির্ভরতা সর্বত্র সংশায়াতীত নয়।

ধ্রুপদী রসায়নের ভিত্তির উপরই অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

রসায়ন একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান যা নবোদ্ভূত আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও শিল্পকর্মে অত্যাবশ্যক। ধ্রুপদী রসায়নের শিক্ষা ও গবেষণায় অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম নিয়েই মূল্যবান ও চমৎকার কাজকর্ম বহু দিন হয়ে এসেছে। স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক বহুমূল্য যন্ত্রপাতির বাজার শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ভারতে সেসবের উপর নির্ভরতা আজ ক্রমবর্ধমান। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার অত্যাশ্চর্য উন্নতির মূলে কাজ করেছে রসায়ন শিল্প, যার ভিত্তি কিন্তু সেই পুরতান ধ্রুপদী রসায়ন। আমাদের এখানে রসায়নের যে চমৎকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তৈরী হয়েছিল তা আজ বিগত প্রায়। আমাদের পুরাতনও থাকলো না, নতুনও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভারতীয় রসায়ন হ'ল বন্ধ্যা। কিছু রসায়ন বিজ্ঞানীর নাম আজ যা শোনা যায় তাঁরা সবাই প্রায় তাত্ত্বিক রসায়নবিদ। তাত্ত্বিক রসায়ন (প্রধানত তরঙ্গীয় বল বিজ্ঞান বা ওয়েভ মেকানিক্স) এর গুরুত্ব মানলেও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে রসায়ন একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান হয়েই আছে, থাকবেও। সুতরাং হাতে কলমে কাজ করে শিক্ষা ছাড়া রসায়নের যথার্থ বোধ ও পারদর্শিতা সম্ভবই না। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন হিন্দু মনীষী ঢুন্ঢুকনাথ বলেছিলেন, -

"যাঁহারা শিক্ষনীয় বিষয় পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যাতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গ মঞ্চের অভিনেতা মাত্র।" আচার্য রায়ও এই মতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, মেঘনাদ সাহাও। প্রাচীন চিন দার্শনিক কনফুসিয়াসের কথা ভূপালের "একলব্য" নিম্নলিখিত ভাবে স্লোগান করে নিয়ে ছিল:

"ম্যয়নে শুনা তো ভুল গিয়া, দেখা তো ইয়াদ রহা, করকে দেখা সমঝ গিয়া।"

আজকে আর এক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কম্পুটারের ব্যাপক সম্প্রসারনে কোথাও কোথাও হাতে কলমে রসায়নের পরীক্ষার বদলে চল হচ্ছে "ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি"-এর, যা কোন মতেই "রিয়েল ল্যাবরেটরির" বিকল্প হতে পারে না।

ভারতীয় রসায়নের দৈন্য দশা

আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগে (১৯৮৮) বেহালায় বিষাক্ত রেপসিড তেল খেয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়, অনেকেই পঙ্গু হয়ে যায়। তাতে যে ট্রাইক্রেসাইল ফসফেট (TCP) বিষ মেশানো আছে তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়ায় হাসপাতালের ডাক্তারাও ছিল অসহায়। কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কোন জায়গাতেই বিষাক্ত যৌগটির সনাক্তিকরণ হতে পারল না। আমার কাছে

এক বন্ধু সাংবাদিক (নাজেশ আফরোজ) একটি প্রামানিক বিষাক্ত রেপসিড স্যাম্পল নিয়ে এল। একজন বিভাগীয় বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক NMR করে বললেন, TCP আছে। আরেকজন IR করে বললেন, নিশ্চিতই নাই। বিভাগের সবাই অসহায়, হতবাক। আমি তখন ধ্রুপদী রসায়ন বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিশ্চিন্ত ভাবেই ফসফেট সনাক্তকরণ ও মোটামুটি পরিমাপ করে আমাদের বন্ধু অধ্যাপক অসিত চক্রবর্তীর মাধ্যমে কলকাতায় বার্তা পাঠালাম। আমার ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে উৎসুক বিভাগীয় অধ্যাপকদের ভীড় জমেছিল। চমৎকার হলদে অ্যামোনিয়াম ফসফোমলিবডেট দেখে সকলেই নিশ্চিন্ত ও হৃষ্ট হলেন।

১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার প্রকৃতি নির্ধারণে ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানীদের করুণ অবস্থা অনেকের হয়তো আজো স্মরণে আছে। বর্তমানে বাংলার ভূগর্ভ জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড বিষণ নির্ণয় ও পরিমাপ করার সস্তা ও সহজ পদ্ধতি আজও অনাবিস্কৃত। এই সব সমস্যা উন্নত পাশ্চাত্য দেশে কম বা নাই। তাই এইসব কাজকর্ম আমাদের বিজ্ঞানীরা না করলে হবে না। এসব থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র ও পিএইচ.ডি থিসিসও হতে পারে।

জীবনজীবীকা উপার্জনের হাজার হাজার রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালী আমাদের অধিগম্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এইসবের প্রস্তুত প্রণালী আগ্রহী ছোট ছোট উদ্যোগপতিদের দিতে পারলে অঞ্চলের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হতে পারতো। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর রসায়ন চর্চা করে বর্তমান লেখক উপলব্ধ হয়েছেন যে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য জিনিষপত্র, সাজসরঞ্জামাদি নিয়ে রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণার অনেক কাজ করা যায়। এবং সে সব থেকে ভাল শিক্ষা, এমন কি ভালো গবেষণাপত্রও প্রকাশ সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত উন্নত দেশ সমূহে এরকমই হয়ে এসেছিল। আমার গবেষণা জীবনারম্ভে আমার শিক্ষক প্রথমেই শর্ত দিয়েছিলেন যে ল্যাবরেটারিতে যা আছে তাই দিয়েই গবেষণার কাজ করতে হবে। নতুন প্রয়োজনীয় কিছুর জন্য পয়সা খরচ করা সম্ভব না, কারণ তাঁর গবেষণার জন্য বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪০০ টাকা। কর্ম জীবনে দুর্ঘটনা ও দূষণমুক্ত ল্যাবরেটারি পুনর্গঠন, সস্তা, সহজলভ্য জিনিষপত্র জোড়াতালি দিয়ে (improvised) নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার চেষ্টা কিছু করলেও বিশেষ সফল হওয়া যায়নি। কারণ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও সহকর্মীদের প্রচলিত পথে পেপার, পিএইচ.ডি. করে উন্নতি করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। রসায়নাগারে ব্যবহারিক প্রযুক্তিকে উন্নত করা, যন্ত্রপাতি এ্যাসেম্বল করা, খারাপ হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি সারানোতে কারো উৎসাহ দেখা যায় না। প্রচলিত কথাই ছিল বোকারা যন্ত্রপাতি সারায়, তৈরি করে, বুদ্ধিমানেরা তা দিয়ে 'ডাটা' নেয়, পেপার করে।

যথার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা:

রসায়ন, প্রকৃতপক্ষে সব বিজ্ঞান শিক্ষাই যথার্থ হয় যখন পঠন-পাঠন, হাতে কলমে কাজ ও উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল যথার্থ বিজ্ঞান মনস্কতা ও স্বদেশের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বাংলায় কেমিস্ট্রি পড়াতেন, স্বেচ্ছায় নিচের ক্লাসেই বেশি পড়াতেন এবং রসায়নের অনেক পরীক্ষাই হাতে কলমে করে দেখাতেন। রসায়ন বিজ্ঞানকে তিনি উৎপাদনের সাথেও যুক্ত করার চেষ্টা করেন। যার ফলশ্রুতি আমরা সবাই জানি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা। নিজেও দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যেসব রাসায়নিক বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি তৈরি করাতাম তাদের বেশ বাজার মূল্য থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি বিপণন করে কিছু অর্থোপার্জন করতেই পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন ও ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন করে শিক্ষাকে গবেষণা ও উৎপাদনের সাথে যুক্ত করতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হতে পারে। কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এইরকম ব্যবস্থাদি তো অন্তর্নির্মিত। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রথাগত লেকচার, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ, গবেষণা ছাড়াও থাকে জনসেবায় চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ ধরণের ব্যবস্থার প্রচলন করতে পারলে আঞ্চলিক রাসায়নিক শিল্প বিকাশেও সহায়তা হতে পারে। আজ থেকে চার দশক আগে আমি ও আমার একজন সহকর্মী বন্ধু মিলে এ বিষয়ে যে প্রস্তাব দেই তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানিন্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ইনডাসট্রিস, ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, পুনের ন্যাশানাল কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারি, বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পালিত মহোদয়রা যথেষ্ট উৎসাহ ব্যাঞ্জক উত্তর

দেন। কিন্তু আমার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রসায়ন বিভাগের বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি। ডিন থাকার সময়ও (১৯৯৫-৯৭) আরেকবার চেষ্টা করেছিলাম। তখনকার উপাচার্যও ছিলেন রসায়নবিদ। কিন্তু কিছু হয়নি।

কুহকিনী আশা:

প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ এবং সহকর্মীদের আগ্রহ না থাকলে যে বিশেষ কিছু করা যায় না, তা দেখেছি। বিগত প্রায় এক দশক ধরে অনেককে বলেছি, লিখেছি। কিছু বইপত্র, সাজসরঞ্জাম, সিডি, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছি। সে সবের সদ্ব্যবহার আজ অনিশ্চিত। বিখ্যাত ভারতীয় রসায়নবিদ CNR Rao, FRS কে জানুয়ারী ২০০৭ সালে একটি চিঠিতে বিনা পারিশ্রমিকে সামান্য স্থান, দু'একজন সহকারি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিনে কাজ করার সুযোগ প্রার্থনা করি। তিনি আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে IISER এর পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসাবে আমাকে কলকাতার IISER এর তানীন্তন আধিকারিক অধ্যাপক সুশান্ত দত্তগুপ্তের (বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য) সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী আমি সুশান্ত বাবুর সাথে ই-মেল ও টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাঁর সাথে সল্টলেক ক্যাম্পাসে দেখা করি। এক কাপ চা ছাড়া সেখান থেকে আর কিছু পাইনি। বুঝেছিলাম সকলেই চাকরি করে। এর পর জানুয়ারী ২০০৮ সালে IACS এর অধিকর্তার সাথে টেলিফোনে ও ই-মেলে যোগাযোগ করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে কাজ করার সুযোগ করে দেবেন। সোসাল রেসপনসোবিলিটি (CSR) এর সুযোগ নিয়ে। কিন্তু সেখান থেকেও কোন সুযোগ মিলল না। এখন তাই দু'একজন বন্ধু ও সারাজীবনের সর্বস্ব সঞ্চয় নিয়ে বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব পালনের দিকে এগুচ্ছি। গড়ে তুলছি কল্যাণী গৃহ সংলগ্ন নবনির্মিত দুটি কক্ষে

Acharaya Prafulla Chandra Ray Institute of Chemical and Environmental Education and Research

রসায়নের দক্ষিণমুখ

ইউরোপ আমেরিকায় ১৯৯০, ২০০০ এ কেমিস্ট্রি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট উঠে গেছে। রাসায়নিক দূষণ নিয়ে বেশ কিছু চর্চা হওয়ায়, বিশেষ করে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর উন্নত দেশগুলিতে ছেলে মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে ইনফরমেশন টেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি প্রভৃতির দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু বিনা বিস্তারনে বলা যায় কেমিস্ট্রির যে দক্ষিণমুখ আছে তা চিরকালই আছে, থাকবেও। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগকে রাসায়নিক যুগ বা 'কেমিক্যাল এজ' বলা হয়। উন্নত দেশগুলির বহুমুখী উন্নতির মূলে আছে রসায়নের বিরাট অবদান। কেমিস্ট্রি একটা মৌলিক, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, যা আমাদের জীবন অর্থনীতিতে বিস্তর উপকারী ভূমিকা পালন করে। এদেশে কেমিস্ট্রি কোনদিনই তেমন জনপ্রিয় হতে পারলো না। ফরাসী বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে প্রগতিশীলতার প্রতীক ছিল বাড়িতে কেমিস্ট্রি চর্চা করা। এদেশে কলকাতাতেই কেমিস্ট্রি কিছুটা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। বর্তমান লেখক তারই কিছুটা উত্তরাধিকার বহন করছে।

২০০৭-০৮ সালে জার্মানির বিখ্যাত BASF কোম্পানি, ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক সোসাইটি, জার্মান ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় ১৭ বগির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সাদা 'সায়েন্স এক্সপ্রেস' নামে একটি ট্রেন আট মাস ধরে ভারতের ৫৭টি শহরে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। আমি দেখেছিলাম। সেখান থেকে সংগৃহীত চমৎকার বর্ণাঢ্য ফোলডারের শুরুতেই লেখা হয়েছে

Chemistry is in the entire world. The entire world is in Chemistry.

কলকাতার BITM এ অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ভালো ভালো জানালা থাকলেও কেমিস্ট্রির কোন জানালা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। BASF এর উপরোক্ত সায়েন্স এক্সপ্রেস কিশোর কিশোরীদের আকৃষ্ট করার জন্যই তৈরি হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য ও ইতিহাসেই সমধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে স্যার আলেকজান্ডার পেডলারের চমৎকার রাসায়নিক প্রদর্শনী সমূহ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি রসায়নই পড়লেন এবং রসায়নিক হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হ'ল। যতদূর জানি বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীর সূত্রপাত করেন মাইকেল ফ্যারাডে। আমরা যখন আই.এস.সি., মানে আজকের উচ্চমাধ্যমিক, পড়তাম (১৯৫৪-৫৬), তখন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সবেতেই

লেকচার হলে যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি সব কলেজেই প্রদর্শিত হতো। লেকচার থিয়েটার সমূহে আজও গ্যাস ও জলের ব্যবস্থার অবশেষ দেখা যায়। বায়োলজিতেও অনেক কিছু দেখানো হ'ত। হায়ার সেকেন্ডারি হবার পর (বোধহয় ১৯৫৯ সাল থেকে) সব উঠে গেল। পাঠ্যবইগুলো মোটা মোটা হ'ল। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, মডেল, সাজরঞ্জামাদি কলেজে কলেজে নষ্ট হ'ল। ভারতীয় বিজ্ঞান প্রাণ হারাল। মানুষের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে রসায়নের শিক্ষা ও গবেষণার যে দৃষ্টান্ত প্রফুল্লচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন, আমরা তাও উপেক্ষা করে আরও বেশী করে বিদেশ-মুখী হলাম।

মিলন মঞ্চ

জীবন সায়াহ্নে এসেও স্বপ্ন দেখা ভুলতে পারি না। বিগত একদশক ধরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বইপত্র যা সংগৃহীত হয়েছে তার সদ্ব্যবহারের কোন সুযোগ কোথাও থেকে যখন পাওয়া গেলই না, তখন বাড়িতে নতুন দুটি ঘর বাড়িয়ে তাতেই বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট শুরুতে প্রয়াসী হতে হল। দূষণ-দুর্ঘটনা মুক্ত পরিবেশে ব্যবহারিক রসায়নচর্চা, কিছু গবেষণা, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের জন্য কিছু রাসায়নিক প্রযুক্তি পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেখানে অবসরপ্রাপ্ত কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের সারাজীবনের অর্জিত মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন দিতে পারবেন, তেমনি তরুণ বয়সীরাও তাঁদের বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনা কাজকর্মের মঞ্চ পেতে পারে। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটারিগুলি অত্যন্ত নোংরা, দূষণ দুর্ঘটনা প্রবণ এখনো রয়েই গেলো। সেখানেই অল্প বয়েসি ছেলে মেয়েরা কাজ করতে বাধ্য হয়। অথচ রসায়ন কন্যারা, যথা: বায়োকেমিস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজি ইত্যাদি, তাদের প্রায়োগিক পদ্ধতি সমূহ যথেষ্ট উন্নত ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের মাতা রসায়ন বিজ্ঞানাগার আজও অবহেলিতই থেকে গেল। স্কুল কলেজে প্রদর্শনীর জন্য আমরা ভ্রাম্যমান রাসায়নিক প্রদর্শনীর একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু এসবে কিছু লোকবল ও অর্থবল অত্যাবশ্যক। কিছু শুরু করতে পারলে এসব আসবে, এমন আশা করতেই পারি। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে এই ইনস্টিটিউটকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যেতেই পারে।

ব্যতিক্রমী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

নিউক্লিয়ার বোমানয় □ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

□ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষাপরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

□ পরিবেশ আইন-কানুন □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

□ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ □ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

□ পরমাণু চুক্তি নয় - বিকল্প শক্তিই ভরসা

পাওয়া যাবে দুহাজার বারো -এর কলকাতা বইমেলায় বিওবি-র স্টলে ও অন্যত্র।
বিওবি-তে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে এবং
অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা)
২/১ এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞান-সমাজ-মানুষ ও পরিবেশ – একটি ভাবনার রূপরেখা

সুমিত ঘোষ

[প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে কাজ করে একটা জীবনদর্শন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য। এবং নিরন্তর তা পরিবর্তনশীল, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতাই মানুষের উপলব্ধির ভিত্তি। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা ছাড়া সেসব নিয়ে সাধারণ মানুষ বড় একটা মুখ খোলেন না। কিন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিঘাতে, ঘাত-প্রতিঘাতে চলে একান্ত ভাবনার নির্মান-বিনির্মান। শুধুমাত্র উচ্চমানের চিন্তাবিদরাই জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষার চর্চা করেন। ভাবনার ভাষা দেন। অভাজনরা তা শোনেন পড়েন, নিজেদের অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে নেন হয়তো। এ পথচলার শেষ নেই। তবু এই অশেষ পরিক্রমায় সবাই আমরা অংশীদার। বাংলাভাষায় এর লিখিত চর্চায় বেশ উৎসাহ ছিল একসময়। এখন তাতে বেজায় টান। টান পড়েছে বিশ্বাস-ভরসার মূলেও। সুমিত ঘোষ সাহস করেছেন আবার তেমন আলোচনা বিতর্ক উস্কে দিতে। জীবনচর্চার পাথেয় তো সেই দর্শনই যা দিশাহীনতা ও অস্থিরতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। - সঃ মঃ]

বিজ্ঞান কোন পথে ঃ ক্রম-উন্নয়নশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একমুখী প্রয়োগ ও বাস্তব রূপায়ণে পণ্যসুধাময় এক বসুধাকে চমকপ্রদ কোন দৃশ্যকল্পভ্রমের রাজ্যে নিয়ে চলেছে? সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণা ও তথাকথিত উন্নয়নমুখী কার্যকলাপ প্রকৃত অর্থে ক্ষমতালোভী শিল্পমালিকগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ফলত এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাস্তব রূপায়ণ হয়ে চলেছে পরিবেশ দূষিত করে, মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী মানুষ ও তার সংস্কৃতি ঐতিহ্য জীবনচর্যাকে ধূলিসাৎ করে। পৃথিবীব্যাপী এর আর একটি ভয়ংকর দিক হল পণ্য-বিপণন বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, ছোট বড় ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর অন্তদ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। নিউক্লিয়ার ও কেমিক্যাল ওয়ারে ব্যাপক গণহত্যা, বসতবাড়ী, হাসপাতাল ধ্বংস-আধিপত্য বিস্তারের জন্য সবই নীতিসম্মত - কেননা বাণিজ্যসর্বস্ব ক্ষমতাসর্বস্ব অহংসর্বস্ব জগতের এটাই নিয়ম। এ কারণে মেগা কেমিক্যাল হাব, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসানোর উগ্র প্রবণতা এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়ের মত ভয়ংকর নেতিবাচক অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে তোয়াক্কা না করে। কিন্তু যা খুবই আশাপ্রদ তা হল মানুষ ও পরিবেশ - এ দুয়েরই প্রতিকূল পথে, নীতিহীন লক্ষ্যে পরিচালিত বিজ্ঞান আর আধুনিক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্দোলন রচনা ও প্রচারের কাজ সর্বত্রই চলছে। ''উন্নয়ন'' ''উদার গণতন্ত্র'' ''বাজার অর্থনীতি'' ''ব্যাপক অন্নসংস্থানের'' স্তোকবাক্য বিশ্বব্যাপী ক্ষমতালোলুপ মান্টিন্যাশনাল সব দেশের বৃহৎ শিল্পমালিক ও বণিকগোষ্ঠীরা এবং তাদের অনুকূল চিন্তার রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিরা যে দিয়ে যাবেন এ কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যখন এ সবের সমর্থনে কলম ধরেন ও কথা বলেন কিছু 'সুশিক্ষিত' মানুষজন ও বুদ্ধিজীবিকূল। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলেন, মানুষের মধ্যে জমে থাকা অন্ধ কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য অনুষ্ঠান সংগঠিত করেন। মানকল্যাণ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি সম্যক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিজ্ঞান ভাবনার এবং বিবর্ত্তনের ধারা ও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও তার দার্শনিক বীক্ষাকে মাথায় রেখে বিজ্ঞান ও সমাজের আত্ম সম্পর্কের সৃজনশীল অন্বেষা সম্পর্কে প্রাগুক্ত বুদ্ধিজীবিকূল উদাসীন বলেই মনে হয়। কিন্তু এ সব বিষয় নিয়ে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ কিছু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সমাজ-দর্শন ভাবনার আগ্রহী বিদগ্ধ মানুষজন। এ সম্পর্কে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় ও তার বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান-মানুষ-প্রকৃতির আত্মিক সমগ্রতার লক্ষ্যে পরিচালিত ভাবনার নানা বিষয় ও উপাদান নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে।

বৌদ্ধিক মুক্তি - মনন চিন্তনের উন্মুক্ত দিগন্ত ঃ বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কোন কোন ব্যক্তির বা কোন কোন গোষ্ঠীর পরিমন্ডলে আজও এমন এক বাতাবরণ সক্রিয় যে ধর্ম বা অধিবিদ্যা মানেই তা অচ্ছ্যুৎ, বিজ্ঞানবিরোধী। কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে বেদান্তদর্শনে বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলা বা সক্রিয় হওয়া যেন পরস্পরবিরোধী। ধর্ম ও অধিবিদ্যা হল তাঁদের মতে বিজ্ঞানবিরোধী। আর মার্কসবাদ একটি অভ্রান্ত সমাজবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সঙ্গে শুধু এই দর্শনেরই আত্মীয়তা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বের আলোকে যখন বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ্যবাদী (Deterministic) চরিত্রের একাধিপত্য অনেকটাই খন্ডিত, খর্বিত তখন মার্কসবাদ, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ ও অধিবিদ্যা এ

সমস্ত বিষয়গুলি ও তার আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অন্বেষা আর ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ কথা সত্য যে ধর্মের নাম নিয়ে কিছু ক্ষমতালোভী সমাজে প্রভাব বিস্তার করে অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে আড়াল করতে চেয়েছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর চার্চ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে ভর্ৎসনা করে তৎকালীন প্রচলিত ভাবনা অর্থাৎ "সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে" এ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এ ঘটনা চার্চের একাধিপত্যের উন্মত্ত আচরণ। ধর্মের নামে চার্চের বা ধমপ্রতিষ্ঠানগুলির এ ভণ্ডামি প্রমাণ করে না যে ধর্ম বিজ্ঞানের বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরূদ্ধাচরণ করেছে। ক্যাথলিক চার্চের নানারকম অমানবিক মতান্ধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানরা ধর্মান্দোলন করেছেন মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে। প্রসঙ্গত বলা যায় ধর্মের ধ্বজাধারী ভণ্ড মানুষজন আমাদের দেশেও সতীদাহ প্রথার মত পাষণ্ড প্রথা অব্যাহত রেখেছিল। জাতপাতের নামে গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী অংশ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের পদদলিত ও অচ্ছুৎ করে রেখেছিল। বিধবাবিবাহ ধর্মবিরোধী শাস্ত্রবিরোধী বলে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল দীর্ঘকাল। আর এ কথা সর্বজনবিদিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক যে এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীচৈতন্য সমাজসংস্কার আন্দোলন করেছিলেন ধর্মের অস্ত্র দিয়েই। আবার সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানও একাধিপত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। সুতরাং ধর্ম বা বিজ্ঞানকে মানুষ ও পরিবেশবিরোধী বলা অসঙ্গত, বরং ধর্মের ও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ মানুষ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। বস্তুত মানুষ ও পরিবেশের জৈবিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত অস্তিত্ব আজ ব্যাপক সংকটের মুখোমুখি।

নির্দেশ্যতাবাদ থেকে সম্ভাব্যতাবাদ (Form Determinism to Probabilistism) ঃ বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণা, আবিষ্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ধারাবাহিকতা বা বিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করেছি তার কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য যে শব্দগুলি, শব্দার্থগত বা পরম্পরাগতভাবে জড়িয়ে আছে তা হল যুক্তিবাদ বা কার্যকারণ সম্পর্ক এবং নির্দ্দেশ্যতাবাদ (Rationality, Causality & determinism)। পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুমান বা প্রকল্প, সূত্র (law) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞানের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে দেকার্ত্রীয় এবং নিউটনীয় ভাবনাই পৃথিবী বা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সত্য। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে একটি বস্তুর প্রারম্ভিক গতিবেগ আর অবস্থান জানা থাকলে তার চূড়ান্ত গতিবেগ জানা যায়। নিউটনের তিনটি গতিসূত্র অমোঘ ও অভ্রান্ত-এ সবই পদার্থবিজ্ঞানের নির্দ্দেশ্যতাবাদী ধারা। এই ধারা স্থূল বহির্ব্রহ্মান্ডে আজও প্রযোজ্য ঠিকই কিন্তু আসল কথা হল পরমানুর মধ্যেকার কণাগুলির ক্ষেত্রে নিউটনের কোন সূত্রই প্রযোজ্য নয়। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ব্যাখ্যা করলেন যে আলোক ও অন্যান্য সব রকম তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণই যুগপৎ তরঙ্গধর্মী এবং বিচ্ছিন্ন কণিকাধর্মী। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ আবার স্পেসের ত্রিমাত্রিকতা ছাড়িয়ে চতুর্মাত্রিক এক অবিচ্ছিন্ন সত্তাকে চিহ্নিত করেছিল যাকে স্পেস-টাইম কনটিনিউয়াম বলা হয়। তা অনুযায়ী দুজন ভিন্ন অবস্থানের চলমান পর্যবেক্ষকের চোখে একই ঘটনা গতিবেগের তারতম্য অনুযায়ী দু ভাবে প্রতিভাত হয়, আর একটি গতিশীল বস্তুর গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের খুব কাছাকাছি বা সমান হয়ে যায় তখন বস্তুর ভর ও শক্তি হয়ে পড়ে অভিন্ন, যার গাণিতিক সমীকরণ হয় $e=mc^2$ (e= শক্তি, m=বস্তুর ভর c= আলোর গতিবেগ)। আর হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র অনুযায়ী একটি পরমাণুর মধ্যে কোন ইলেকট্রন এর অবস্থান ও বেগ একই সঙ্গে নির্ণয় করা যায় না, তবে তার অবস্থানের সম্ভাব্যতা অনুমান করা যায়। এই সম্ভাব্যতা বস্তুর সম্ভাব্যতা ঠিক নয় বরং পারস্পরিক সম্পর্কের সম্ভাব্যতা। "At the sub-atomic level, solid material objects of classical physics dissolves into wave-like pattern of probabilities and these patterns, ultimatily do not represent probalility of things but rather probability of inter connections" (ফ্রিটজফ কাপরা)। এসবই এখন কোয়ান্টামতত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি। কোয়ান্টামতত্ত্বে সম্ভাব্যতাবাদের যে জগত বিজ্ঞানে উন্মোচিত হল তা নিউটনীয় বিশ্বের চেয়ে মৌলিকভাবেই পৃথক। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব ঘটনা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একক অখন্ডতার একটি বীক্ষণে উপনীত করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ভাবনার শিবিরের

মানুষজনেরা সাধারণভাবে স্বীকৃত কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের আপত্তি আগেই প্রকাশ করেছেন। "প্ল্যাঙ্কস ডিসকভারি অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল প্রবলেমস্ অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স" প্রবন্ধে হাইজেনবার্গ বলেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান "প্রকৃত বাস্তবের ধারণাকে শেষ বিচারে বাতিল করেছে এবং বস্তুবাদী দর্শনের পরিবর্তিত হওয়ার এটি অবশ্যই প্রারম্ভিক প্রেক্ষিত।" হাইজেনবার্গের এই ভাবনাটি চিন্তা-উদ্দীপক এবং যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকও বলে মনে হয়। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে নানারকম সামাজিক অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে নতুন মাত্রার কথা বা সমালোচনাভিত্তিক অন্তদৃষ্টির কথা অনেক চিন্তাবিদই ব্যক্ত করেছেন - যেমন এরিক ফ্রোম, মারকিউস, এ্যাডর্ণো, গ্রামসি, পল সুইজি, জন বেলামী ফষ্টার ইত্যাদি।

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঃ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার কথা, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধাচরণের কথা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিভিন্নভাবে বিবৃত রয়েছে।বেদের ঋষিদের উপলব্ধি অনুযায়ী প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সৃষ্টি, পরিবর্তন, ধ্বংসলীলা বিষয়গুলি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোন অমোঘ ঘটনা। জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং পারস্পরিক আত্মিক যোগের কথা তাঁরা বলেছেন। আজকের পৃথিবীতেও বিজ্ঞানীরা বিস্তর ভাবনাচিন্তা করছেন পরিবেশ-দূষণমুক্ত রাখা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে। স্টকজোম, রিও-ডি-জেনারিও, কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত শীর্ষসম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মার্কিন দেশ ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিই অনবরত লঙ্ঘন করে চলেছে। জন বেলামি ফষ্টার তাঁর "একোলজিক্যাল রেভলিউশন" গ্রন্থে মানব প্রজাতির সামনে এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীব্যাপী ভূমিকম্প, অম্লবৃষ্টি, উষ্ণায়ন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, ঋতুবৈচিত্রের সহজাত সৌন্দর্য্যের ক্রম-অবলুপ্তি-এ ঘটনাগুলি প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশের উদার এক সমগ্রের, অখন্ডের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের প্রগাঢ় অনুভবকে বিঘ্নিত ও বিধ্বস্ত করছে। কাপরা তাঁর "Turning Point" গ্রন্থে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোলিষ্টিক মেডিসিনের কথা বলছেন। ডক্টর অরুণ শীলরাও 'টোটাল এ্যাণ্ড ইনটিগ্র্যাল' মেডিসিনের কথা বলেছেন। বিজ্ঞানী কাপরা এবং ডাক্তার অরুণ শীল দুজনেই সমস্ত চিকিৎসাধারার একটি সুষম সমন্বয় ও বিন্যাসের কথা বলেছেন কোন ধারাকেই বাতিল না করে। সামগ্রিক চিকিৎসা বা Holistic medicine এর মাধ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এক বৌদ্ধিক মুক্তি ও নতুন দিগন্তের অন্বেষাই সম্ভবত তাঁদের মনন-চিন্তনে সক্রিয়। অধ্যাপক ষ্টিভেন রোজও বলেছেন "একোলজির মত মুক্ত ও গভীরভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত সিসটেমের ব্যাখ্যায় রিডাকশনিষ্ট বিজ্ঞান অপারগ।" প্রসঙ্গত পরিবেশ সম্পর্কে "Economic and Philophical Manuscript এ কার্ল মার্কস লিখেছেন "মানুষ প্রকৃতিরই জীব, অর্থাৎ প্রকৃতি তার অবয়বের মত এবং মানুষ আর প্রকৃতির পারস্পরিক আত্মিক যোগ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।" পরিবেশ সংক্রান্ত এমন সুন্দর সংবেদনশীলতা মার্কসবাদী পরম্পরায় বহুলাংশেই অনুপস্থিত। তবে নতুন ধারার চিন্তাবিদদের গবেষণা অধ্যয়ন সমাধান-এর প্রয়াস দৃষ্টান্তমূলক এবং নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদানে খুবই সহায়ক। সংকটের বাস্তবতা, সমাধানের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির মধ্য থেকেই উঠে আসছে চিন্তা ও চেতনার আলোড়ন। বিজ্ঞান-সমাজ-দর্শনের নতুন কোন বীক্ষণের অন্বেষা আজকের এ সার্বিক সংকটের বিশ্বে অসঙ্গত নয়। মানবকল্যাণমুখী পরিবেশ বান্ধব বিজ্ঞান ও সমাজ এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বপ্ন দেখার দার্শনিক চেতনার সন্ধানী আজ অনেকেই। সফলতার ক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হ'ল সৎ মানবিক প্রয়াসে নিয়োজিত সকল বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ মানুষ এবং অন্য সব মানুষজনের বৌদ্ধিক মুক্তির সচেতন অন্বেষণ এবং পারস্পরিক আস্থা, সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে ভাবনা বিনিময়ের একটি উন্মুক্ত বাতাবরণ।

নির্দেশিকা ঃ

1. Tao of Physics - Fritzoff Kapra, Flemingo (Harper Collins), 1991
2. Turning Point - Firtzoff Kapra, Flemingo (Harper Collins), 1982
3. Planck's Discovery and Philosophical problems of Nuclear Physics - Werner Heisenleng
4. Total and Integral Medicine - Dr. Arun Sil, Otimanas Prakashan, Kolkata
5. Origin of Environmental Science form Vedas - Shashi Tiwari
6. Ecological Revolution - John Belami Foster.

সাময়িকী

রুগীর নিরাপত্তা ঃ ভুল থেকে শেখা

অসীম চ্যাটার্জী

যখন কোন ভুলের ফলে কোন রুগীর কোন ক্ষতি হয় যা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী উভয়েরই অনভিপ্রেত তখনই প্রশ্নটা উঠে আসে-এটা কি এড়ানো যেত না ?অনেক সময় এ প্রশ্নও উঠে আসে, এটা কি ভাবে সম্ভব হল ? ভুলের দায় কোন একজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়াটা সহজেই করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা করাও হয়ে থাকে। কিন্তু এটা আসলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। মূল সমস্যা কিন্তু অনেক গভীরে। কোন একটি মাত্র ব্যক্তির জন্য কোন স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে এমনটা না ভেবে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যাপার গুলির সার্বিক পর্যালোচনা করলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবাজনিত রুগীর ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। হু'র সমীক্ষায় জানা গেছে হাসপাতালে ভর্তি রুগীদের ৫-১৫% ক্ষেত্রে কোন না কোন স্বাস্থ্য পরিষেবাজনিত ভুলের শিকার হতে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিষেবা জনিত স্বাস্থ্য দুর্ঘটনার হার কিভাবে কমান যেতে পারে তা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে ও অন লাইনে একটি কোর্সও চালু করেছে। আমরা এর মূল বিষয় বস্তু গুলো আলোচনা করব যাতে লোকেদের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কমে এবং এর ফলে যে অবাঞ্ছিত সমস্যার উদ্ভব হয় তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মূল সমস্যা ঃ

ভুল হবার কারণগুলো কমাতে হলে পাঁচটি মূল সমস্যার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

১। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা।

২। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল স্বাস্থ্য কর্মীদের দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ান।

৩। পরিষেবা প্রদানকারী এবং পরিষেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সরাসরি যোগযোগ স্থাপন (যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে)।

৪। ওষুধ জনিত ভুল সম্বন্ধে আগাম সতর্কতা গ্রহণ করা।

৫। রুগী এবং পরিবারের লোকেদের তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

স্বীকৃত পদ্ধতি - প্রতিটি অপারেশনের জন্য একটি স্বীকৃত নিরাপদ পদ্ধতি রয়েছে যা ওই অপারেশনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। একে 'প্রটোকল' বলা হয়। অপারেশনের ঝুঁকি কমাতে এর বিকল্প নেই। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রটোকল ঠিকমত অনুসরণ করতে চান না। প্রটোকল না মানতে চাওয়ার কারণগুলো হল - তাঁরা মনে করেন এগুলি তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত দক্ষতা প্রকাশ পাবার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ। অথবা এতে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হবে। প্রটোকলের প্রশিক্ষণ না থাকার জন্যও অনেকে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন। সর্বোপরি নতুন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করায় উদাসীন মনোভাব তাঁদের অজান্তেই ভুলের দিকে এগিয়ে দেয়। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণের বিপক্ষে অনেক সময় সওয়াল করা হয় যে এটি ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত নেবার পরিপন্থী। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করার অর্থ কোন 'মালের জোগান সুনিশ্চিত করা' নয়। বরং এটি একটি পদ্ধতি যার সঠিক প্রয়োগের ফলে ঝুঁকি পূর্ণ প্রক্রিয়ার (যেমন অপারেশনের ক্ষেত্রে) ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। নিউজিল্যান্ডে সম্প্রতি অ্যানেসথেটিস্টদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালান হয় যেখানে কুড়ি জন অ্যানেসথেটিস্টকে এক অনুরূপ পরীক্ষা (simulation test) পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে অপরেশন চলাকালীন অক্সিজেন সাপ্লাই ১৫ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। সব কজন অ্যানেসথেটিস্ট'ই ওই সময়ে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বিকল্প অক্সিজেন সিলিন্ডার টি লাগিয়ে ছিলেন কিন্তু ৭০% জনই লক্ষ্য করেন নি, যে বিকল্প অক্সিজেন সিলিন্ডারটি রাখা ছিল সেটি খালি (তাঁরা অপারেশন শুরু হবার আগে বিকল্প সিলিন্ডার ভর্তি আছে কি না তা দেখে নেন নি)। এবং এঁদের কেউই আবার যখন গ্যাস সাপ্লাই খুলে দেওয়া হল তখন ও দেখে নিলেন

না যে গ্যাস মিশ্রণ তাঁরা রুগীর ফুসফুসে প্রবাহিত করছেন তাতে গ্যাসের মাত্রাগুলি সঠিক রয়েছে কিনা। অথচ এই পরীক্ষাগুলি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অপারেশনের আগে আপৎকালীন ব্যবস্থা যাচাই করার প্রক্রিয়া যা অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও অনুসরণ করেন নি।

একই ভাবে শিশু বিভাগে 'রুগীর শ্বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে' অনুরূপ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলি খামতি ধরা পড়ে - ১৭% ক্ষেত্রে সঠিক ডোজ নথিবদ্ধ করা হয় না, ৫৯% ক্ষেত্রে কি ভাবে ওষুধ দেওয়া হয়েছে লেখা নেই, ১৬% ক্ষেত্রে সিরিঞ্জ গুলি'তে যা ওষুধ যাওয়ার কথা তার ২০% এরও বেশি বা কম মাত্রায় ওষুধ গেছে।

এই উদাহরণগুলো স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা যায়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভুলের সম্ভবনা কমে, রুগীরাও জানতে পারে তারা কি ধরণের চিকিৎসা পেতে চলেছে এবং তারাও অনেক সময় চিকিৎসার মান বাড়াতে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে পারে।

সঠিক এবং স্বীকৃত প্রশিক্ষণ - সাধারণত স্নাতকস্তরে চিকিৎসা পাঠ্যক্রমে (যেমন এমবিবি এস কোর্সে) রুগীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটি পাঠ্যক্রমের একটি দুর্বলতা এবং সঠিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গভীর ব্যর্থতা যার দরুন স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরাপত্তা ব্যহত হয়। প্রধানত দুটি জায়গায় ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এক, রুগীর চিকিৎসার দরুন যে সমস্যা হতে পারে যার পূর্বানুমান ও ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কীয় ঘাটতি। দুই, দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব যারা আধুনিক ও নিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এবং সময়ের সাথে সাথে এই ঘাটতি বাড়তে থাকে। (এটা বিশেষ ভাবে আমাদের রাজ্যে দেখা যায় যেখানে রুগী নিরাপত্তা জনিত দক্ষ পরিষেবার অভাবে রুগীদের অন্য রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়।) বিভিন্ন পেশায় বিশেষ করে বিমান যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিষেবা কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে যেখানে যাত্রী নিরাপত্তা বিষয়টি সর্বাধিকার দেওয়া হয়। এখানে কোন আপোষ করা হয় না। রুগী নিরাপত্তাকে যদি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে একে ঘিরে এক প্রশিক্ষণ বলয় গড়ে উঠতে পারে যা এই পেশাকে একটা সদর্থক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে স্কটল্যান্ডের স্নাতকস্তরে চিকিৎসা শিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে রুগী নিরাপত্তা জনিত শিক্ষণ বিষয়গুলি বিভিন্ন মডিউলের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেখানে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ছাত্রদের শেখান হয় ভুল স্বীকার করার মানসিকতা। মানুষমাত্রেরই ভুল হতে পারে এটা মেনে নিয়ে ভুল কোথায় হয়, ভুল কিভাবে এড়ানো যেতে পারে, চিকিৎসা নির্দেশগুলি পরিষ্কারভাবে নথিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা (নিজের ভুলও) এবং ভুল সংশোধনের অন্যান্য ঝুঁকি পূর্ণ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি (যেমন যান পরিবহন সংস্থা, পানীয় জল সরবরাহ সংস্থা, বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ এবং নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা (ডিসপোসাল প্রভৃতি) কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে সে গুলি গ্রহণ করা চিকিৎসা প্রশিক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

মানুষের ভুল হয়। ভুল ঘটে তার যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতির জন্য। পরিবেশ, বিশ্রাম না পাওয়া, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাস্থ্য কর্মীদের ভুলের দিকে ঠেলে দেয়। যে সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আলাদা করে দক্ষতা অর্জনের ট্রেনিং এর দরকার নেই সেই সব ক্ষেত্রেও ভুলের দরুন সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যহত হয় যার ফল রুগী ও বাড়ির আত্মীয় স্বজনদের ভুগতে হয়। যদিও চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যক্তি দক্ষতার মান ও উন্নতির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিকিৎসা পরিষেবার নির্দেশিকার মধ্যেই রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না (বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে সামাজিক বৈষম্য অবলুপ্তির হাতিয়ার হিসাবে লোকেদের এই পেশায় চাকরিতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় রুগীর নিরাপত্তার কথা না ভেবে)। একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা, কাজের প্রস্তুতি, সিদ্ধান্ত নেওয়া, ঝুঁকি নির্ধারণ করা এবং ফলাফল কি হতে পারে আন্দাজ করে সেই অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা তৈরী রাখা, নিজের এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তির লিমিটেশন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা, এই সমস্ত কিছু এক গভীর দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে এবং চিকিৎসা পরিষেবার মান বাড়াতে ও ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

অনুরূপ শিক্ষা (simulation) স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের রুগী ও সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলার দক্ষতা অর্জনের জন্য (বিশেষ করে আপৎকালীন শুশ্রূষা) হাতে কলমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যতটা এই পেশায়, এমনটা আর কোন পেশায় নেই। কিন্তু এটা বাস্তব যে তার শিক্ষানবিশি সময়ের মধ্যে তার সব কটি রুগী দেখার ও সমস্যা মোকাবিলা করার সুযোগ না হতে পারে। অনুরূপ শিক্ষণ পদ্ধতি এই ঘাটতি মেটাবার জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপায়। এখানে দক্ষতা বাড়ানর সঙ্গে একটি দল হিসাবে কাজ করার সুবিধা, চিকিৎসার ফলাফল কে কি ভাবে প্রভাবিত করে তা জানার হাতে কলমে অভিজ্ঞতাও লাভ হয়।

চিকিৎসা বিদ্যা কে যুগ যুগ ধরে গুরুমুখী বিদ্যা হিসাবে দেখা হয়ে এসেছে। 'যেটি শিখেছ সেইটিই অনুশীলন কর, সেইটিই শেখাও' - এমন ধারণা নতুনকে গ্রহণ করার পক্ষে এবং সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব একজন স্বাস্থ্য কর্মীকে তার নিজের দক্ষতার মূল্যায়নের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং অযথা ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করতে পারে। রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় স্তরে এজন্য চিকিৎসার উপযুক্ত মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিরাপদ ও ফলপ্রসূ হয়।

যোগাযোগ - তথ্যের সঠিক আদান প্রদান সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম শর্ত। সমীক্ষায় জানা গেছে চিকিৎসার ভুলের পিছনে ৬০% ক্ষেত্রেই যোগাযোগের অভাব কাজ করেছে। সমন্বয়ের অভাব দু রকমের হতে পারে - স্বাস্থ্য কর্মীদের নিজেদের মধ্যে, অথবা স্বাস্থ্যকর্মী এবং রুগীর মধ্যে।

রুগী ও স্বাস্থ্য কর্মীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ একটি জটিল বিষয় এবং খুব হালে এ বিষয়টিতে আলোকপাত করা হচ্ছে ও বিষয়টি বোঝার চেষ্টা চলছে। পঞ্চাশ বছর আগে রুগীরা চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ক্ষমতার ওপর একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল ছিল এবং এ বিষয়ে তাদের মতামতই চূড়ান্ত ধরা হত। এখন রুগীরা চিকিৎসককে তাদের একটি জটিল সমস্যার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখতে চায় এবং এই প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের (অর্থাৎ রুগীদের) ঘিরে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে তাতে নিজেদের মতামত ও ভূমিকা গ্রাহ্য হবে এমনটাই আশা করে। এই দুই বিপরীত মেরুর আচরণের কোন একটি সব ক্ষেত্রে আদর্শ যোগাযোগ রক্ষা করবে ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করবে এমনটা মনে করা ঠিক নয় বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের রকমফের করাটাই উচিত কাজ হবে। রুগী ও চিকিৎসকের মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে বার্তা বিনিময় হয় যেমন কথা লেখা প্রভৃতি। এর মধ্যে অঙ্গ ভঙ্গীর মাধ্যমে শরীরী বার্তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে সামান্যই কাজ হয়েছে। চিকিৎসকের হাবভাবে চিকিৎসক কি বললেন রুগী বা বাড়ির লোক অনেক সময় ভেবে নেয়। এবং সেই ভাবা তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যদি রুগী (এবং বাড়ির লোকেরা) ও স্বাস্থ্য কর্মীর মধ্যে সরাসরি এমন ভাষায় কথা হয় যা তারা উভয়েই বুঝতে পারে তাহলে শুধু ভুল বোঝাবুঝিই কমে না, চিকিৎসার খরচেরও সুরাহা হয়। যেটা এখনও পরিষ্কার নয় কি ভাবে সেটা সম্ভবপর করা যায়। পেশাদার দোভাষীর সাহায্য নেওয়া অবশ্যই একটি উপায়, কিন্তু তাদের সহজে পাওয়া যায় না উপরন্তু খরচের একটা ব্যাপার থাকে। সরাসরি কথা বলার মধ্যেও দেখা গেছে আলোচনায় স্বাস্থ্য কর্মী এমন সব ডাক্তারি শব্দ ব্যবহার করছেন যার অর্থ রুগীর বোধগম্য হচ্ছে না। অনেক সময় তাঁরা এমন সব প্রশ্নের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন যার উত্তর হ্যাঁ অথবা না। এর ফলে রুগীর বা বাড়ির লোকেদের আলোচনায় অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর একটি সমস্যাও রয়েছে- কিভাবে অপারেশনের বা অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতির ঝুঁকি রুগীকে অযথা আতঙ্কিত না করে বোঝান যায় তার পদ্ধতি। স্বাস্থ্য কর্মীদের এর জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার কিন্তু সুযোগ সীমিত। স্বাস্থ্য কর্মী এবং রুগীর যোগাযোগের আর একটি উপায় লিখিত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা এর এক বড় অন্তরায়। এছাড়া বহু লোক লিখিত তথ্য ঠিকমত বুঝতে পারেন না। অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিও দুর্লভ।

স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব রুগীর নিরাপত্তা ব্যাহত হবার পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ডিউটি পরিবর্তনের সময় অসম্পূর্ণ 'হ্যান্ড ওভার', অপরিষ্কার লেখা ঠিকমত পড়তে না পারা এবং পরিষ্কার নির্দেশ না লেখা এর কয়েকটি উদাহরণ। এছাড়া জুনিয়র ডাক্তারের সিনিয়র ডাক্তারের ভুল কে দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ না করতে পারার মানসিকতাও চিকিৎসা জনিত ভুলকে বাড়তে সাহায্য করে (এর জলন্ত প্রমাণ এ রাজ্যে সাম্প্রতিক কালের একটি মামলা যেখানে একজন প্রবীণ চিকিৎসকের ভুল আদালতে প্রমাণিত হয়েছে)। বিশেষ করে হাসপাতালে এটা প্রমাণিত, স্বাস্থ্য পরিষেবা একজনের সিদ্ধান্তের ওপর না ছেড়ে দিয়ে একটি গোটা দলের সবাইএর সঙ্গে জড়িত থাকলে ভুলের সংখ্যা কমে এবং ভুলের দায়িত্ব স্বীকার করার মানসিকতা অনুশীলন করলে ক্ষতিপূরণের মামলার সংখ্যাও কমে। ভুল করার পর সেই ভুলের দায় এড়ানোর চেষ্টার চেয়ে রুগীর আত্মীয় স্বজনদের কাছে সঠিক তথ্য জানান অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার থেকে রেহাই দেয়।

ওষুধ সম্পর্কীয় নিরাপত্তা - অতীতে ওষুধ সম্পর্কীয় নিরাপত্তার ধারণা ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকে ঘিরেই তৈরী হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ভুল ওষুধ ব্যবহার, ভুল মাত্রায় প্রয়োগ, ভুল পথে (যেমন পেশীতে না দিয়ে শিরায় দেওয়া, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মধ্যে দেওয়া প্রভৃতি) প্রয়োগ তালিকাটি দীর্ঘ করেছে। সমীক্ষায় প্রকাশ হাসপাতালে ভর্তি ৫-১০% রুগীর মৃত্যুর কারণ ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ফলে যা ৭৫% ক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব। এছাড়া প্রতি তিন জন রুগী ভর্তির মধ্যে একজন কোন না কোন ভুল ওষুধ প্রয়োগের (অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সহ) শিকার হন। ডাক্তারের খারাপ হাতের লেখা নিয়ে রসিকতা চালু রয়েছে যে তাদের লেখা প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম পাঠোদ্ধার করা যায় না। এটা কিয়দংশ সত্যি হলেও প্রেসক্রিপশনে আরও অনেক কিছু রয়েছে যা সমান গুরুত্বপূর্ণ যেমন ওষুধের মাত্রা, সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্ত ওষুধের প্রয়োগ বিধি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রেসক্রিপশনের বাইরের ওষুধ, যেমন ওষুধের দোকানীর কথায় ওষুধ কেনা ও খাওয়া আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। ওষুধ নিয়ে অসুস্থ বোধ করলে তা স্বাস্থ্যকর্মীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে রুগী ও বাড়ির লোকেদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্যকর্মী ও রুগীর পারস্পরিক সুষ্ঠু বোঝাপড়া থাকলে এধরণের দুর্ঘটনার হার কমে। ওষুধের প্রয়োগ বিধি লেবেল সেঁটে, হাতে লিখে দেবার চল বহু জায়গায়ই রয়েছে। প্রয়োজন নজরদারীর, যাতে একজনের ভুল অন্য জনের সহজেই নজরে পড়ে। এবং যে সব ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মারাত্মক সেই সব ওষুধের প্রয়োগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়েই একমাত্র করান উচিত। কাছাকাছি নামের ভিন্ন ওষুধ ভুলের সুযোগ বাড়ায়। এছাড়াও দরকার রুগী ট্রান্সফার বা ছুটির সময় পরিষ্কার ভাবে রুগী কি কি ওষুধ কখন কিভাবে নেবে তা লিখে দেওয়া। অনেক ওষুধই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত তা না হলে তার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সন্দেহ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সতর্ক করার ব্যবস্থা ভবিষ্যতের বড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা করে।

রুগী ও বাড়ির লোকেদের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করা - অনেক রুগীর চিন্তাতেই থাকেনা যে চিকিৎসা গ্রহণ করার মধ্যে কোন ঝুঁকির সম্ভবনা থাকতে পারে। চিকিৎসা দেওয়া এবং নেওয়া পরিষেবা একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। রুগীদের সেই পরিষেবার মধ্যে আরও বেশি করে যুক্ত করা সেই বিশ্বাসের অবস্থান কে দৃঢ় করে ও রুগী নিরাপত্তা বিষয়টিকে মজবুত করে। বিভিন্ন ভাবে এটা করা যেতে পারে। যেমন - রুগীদের তাদের রোগ ও সম্ভাব্য চিকিৎসা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ছবি সামনে রাখা (অবশ্যই প্রাপ্ত তথ্যের ও অনুমানের ভিত্তিতে) যাতে তারা চিকিৎসা গ্রহণ করা বা না করা সম্বন্ধে মতামত দিতে পারে। রুগী ও তার পরিবারের লোকেদের তাদের আশঙ্কার কথা (চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত) স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করা একটি সদর্থক পদক্ষেপ এবং পরিবারের কেউ যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। রুগী সহায়তা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সংস্থাগুলি চিকিৎসা নিরাপত্তা বিষয়গুলি তাদের কাজের পরিধির মধ্যে রেখেছে এবং তাদেরও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করা দরকার। এখানে রুগীদের নিজেদের

অভিজ্ঞতার বিনিময় ও একটি সুস্থ ও নিরাপদ চিকিৎসা পরিষেবার পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে।

রুগীরা অনেক সময় তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে মতামত দিতে ইচ্ছুক হয় না কারণ এটা তারা তাদের অধিকারের পরিসীমার বাইরে বলে মনে করে। তারা অনেক সময় চিকিৎসা পরিষেবার ঝুঁকির কথা জানে না এবং এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে। চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রুগীর লিখিত ও মৌখিক সম্মতি অনেক অবাঞ্ছিত জটিলতা থেকে রক্ষা করে। স্বাস্থ্য কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে রুগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কে সহজ ভাবে নিতে পারে না। বিশেষ করে যখন রুগী নিম্ন বিত্ত শ্রেণী থেকে আসে। তাদের ধরেই নেওয়া হয় তারা নিজেদের চিকিৎসা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। অনেকে এটাও ভাবেন রুগীদের চিকিৎসা জনিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করতে দিলে অযথা সময় ব্যয় হয় যদিও এ ধারণা সঠিক নয়।

রুগী এবং তার পরিবারের লোকজন তখনই অভিযোগ করে যখন চিকিৎসায় অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে। তারা একটা নিশ্চুপ নিরুত্তর দেওয়ালের মুখোমুখি নিজেদেরকে আবিষ্কার করে যা তাদের অধিকারকে অস্বীকার করছে এমন কি তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণও করছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রুগী চিকিৎসকের পারস্পরিক বিশ্বাসে সহজেই ভাঙ্গন ধরে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সঙ্গে রুগী মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে স্বাস্থ্য কর্মীর ইচ্ছাকৃত অসাবধানতায় তার ক্ষতি (করা) হয়েছে। আমাদের দেশের বহু জায়গায় রুগীরা কোনরূপ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে, তাই তারা চিকিৎসার গাফিলতির দরুন ক্ষতির কারণ নিয়ে নাড়া চাড়া করতে চায় না। তারা মনে করে এতে তাদের চিকিৎসকের প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ করা হবে। অথবা যেটুকু পরিষেবা পাচ্ছিল সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হবে। রুগীরা অনেক সময় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করে যে কারণ জানতে চাইলে তাদের চিকিৎসা জনিত ভুলের তথ্য প্রকাশ করা হয় না। এর পরিণামে মামলা মকদ্দমা আইনি ব্যবস্থা এমনকি হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে যায়।

সাম্প্রতিক কালে রুগীরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পারস্পরিক স্বচ্ছ এবং অকপট সম্পর্ক স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম শর্ত। স্বাস্থ্য কর্মীদের দিক থেকে রুগীদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার দেওয়াটা তাদের পরিষেবার মধ্যেই পড়ে। রুগী চিকিৎসক সম্পর্কে যাতে বিশ্বাসের জায়গাটা অটুট ও মর্যাদাপূর্ণ থাকে তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ব্যতিক্রমী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

নিউক্লিয়ার বোমা নয় □ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

□ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

□ পরিবেশ আইন-কানুন □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

□ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ □ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

□ পরমাণু চুক্তি নয় - বিকল্প শক্তিই ভরসা

পাওয়া যাবে দুহাজার বারো –এর কলকাতা বইমেলায় বিওবি–র স্টলে ও অন্যত্র।

বিওবি–তে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করুন।

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা–সাড়ে আটটা) ২/১ এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

সাময়িকী

স্বাস্থ্যে পণ্যায়ন ঃ এখন

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতারা জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বুনিয়াদী অধিকার বা মৌলিক অধিকার এর মর্যাদা দেননি। এর স্থান ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের নীতি নির্ধারক পরিচ্ছেদে - যার নির্দেশগুলি সরকারে পক্ষে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আশু পালনীয় বলে বাধ্যবাধকতা কিছু নয়। এগুলি নির্দেশাত্মক (Directive) নয়, কেবল সুপারিশমূলক (Suggestive), অথচ জীবন ধারণের অধিকার মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্য কিন্তু নয় মৌলিক অধিকার। আর স্বাস্থ্যের স্থানও হয়েছে রাজ্য তালিকায় - কেন্দ্রীয় তালিকায় নয়। কাজেকাজেই, গোড়াতেই গলদ রয়েছে এবং রাষ্ট্রকর্তারা এটা বোঝেন নি বা বোঝেন না তা নয়। আমাদের দেশের পরিষেবাগুলোও আস্তে আস্তে সরকারী নাগালের বাইরে বেসরকারীকরণের দিকে ঝুঁকছে। এই প্রবণতা বিগত শতাব্দীর নয় এর দশক থেকে ধাবমান। সাম্প্রতিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য ও জনচিকিৎসার অবস্থা আমরা জানতে পারি - যা এক কথায় ভয়াবহ এবং অনুন্নত জীবনযাত্রায় এ এক অতুলনীয় উদাহরণ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) এর তালিকায় ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১২৫ নম্বরে (২০০৪ সালে) আর এখন তা আরো নেমে এসেছে ১৩৪ নম্বরে (২০১১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী)। সাম্প্রতিক 'ঐ' সমীক্ষা অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাশির পরিসংখ্যান এইরকম ঃ

দারিদ্রসীমার নীচে মানুষ - (শহরে মাসে ৪৫৪ টাকা ও গ্রামে মাসে ৩২৭ টাকা আয়ের কম আয়)	২৭.৪%
দিনে ১ ডলারের (=৪৮ টাকা) কম আয়	৩৫% মানুষের
রাষ্ট্রীয় খরচে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পান	৫৮% মানুষ
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় যত ব্যয় হত তাতে রাষ্ট্রে অনুদান	২৩.৫% (২০১১ সালে সেটা কমে ২০% এ নেমেছে)
প্রতি লক্ষ মানুষে ডাক্তারের সংখ্যা	৭ জন
প্রতি লক্ষ মানুষে সেবিকার সংখ্যা	৭.৩ জন
প্রতি লক্ষ মানুষে হাসপাতালের সংখ্যা	৯টা
অপুষ্টির শিকার	৬.১ কোটি
৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যু (হাজারে)	৭৬ জন
মোট শিশুর মৃত্যু (হাজারে)	২১ লক্ষ
শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি	যথাক্রমে ৭৪% ও ৪৭%
মোট অপুষ্টিতে ভোগা শিশু	২.২ কোটি
যক্ষারোগী ও যক্ষায় মৃত্যু (যথাক্রমে)	দেড় কোটি ও বছরে ৫ লক্ষ
পেটের অসুখে (Diarrhoea) শিশুমৃত্যু (বছরে)	১০ লক্ষ
অন্ধ মানুষ (পুষ্টির অভাবে)	৭০ লক্ষ

অথচ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই যখন দেশের অবস্থা তার জন্য অগ্রাধিকার পায় না টিবি, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, কলেরা বা এনকেফেলাইটিস কে প্রতিহত করার ব্যবস্থা যাতে এই সমস্ত অসুখে লক্ষ লক্ষ মানুষ না মারা যায়। উল্টে আইন বানিয়ে দেশী বিদেশী ব্যবসাদারদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবসা গড়ে তোলা - পাঁচতারা, সাততারা হাসপাতাল গড়ে তোলা। নতুনভাবে ফিরে আসা প্লেগ, ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া সহ নানা সংক্রামক অসুখের মহামারী ঠেকাবার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হল না - অথচ দেশের মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) গড়ে দেশের মানুষের অর্থে ঢালাও ভরতুকি দিয়ে একটা মেকী উন্নয়নের মডেল তৈরী হয়ে গেলো। স্বাস্থ্যবাজার তৈরী হলো - বাড়তে লাগলো আর সরকারের হাতে পরিষেবা যতটুকুও বা ছিল তা শিথিল হতে শুরু করলো - বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছেয়ে গেলো গোটা দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে অথবা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগ শুরু হলো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ যা সরকারি মুখোশে বেসরকারি বাণিজ্য। সংবিধানের ধারাতেই স্বাস্থ্য চিকিৎসা আর সেবা নয় - 'পণ্য' বলে রূপ দেওয়া হলো; বাস্তবে তো বটেই।

আমরি এপিসোড

আমরি কান্ডে নিহতদের মধ্যে কোনও কোনও পরিবারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো দুলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কাগজপত্র এসে গেলেও আমরি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও মৃতদের পরিবারের সাথে তেমন কোন যোগাযোগ করা হচ্ছে না। এটা এখন আর সংবাদ মাধ্যমের 'খবর' হয়ে উঠছে না। কারণ, সংবাদমাধ্যমও জানে পরিশেষে 'খবর' বেচা খবর এখন আর এটা নয় - সদ্য সদ্য ঠিক ছিল; তাছাড়া ব্যবসায়িক পরিমন্ডলকে বারবার চ্যালেঞ্জ ছোঁড়াটা আখেরে মিডিয়ার-ই ক্ষতি। তাই আরো সময় নিয়ে আমরি কান্ড আস্তে আস্তে অন্তরালে চলে যাবে - স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবায় যে দুর্বৃত্তায়ণ এবং বেসরকারীকরণ তার অবাধ রাস্তা বদলাবে না - পরিস্থিতিটা এরকমই। আমরিরর ঘটনাটা ঘটে ৯ ডিসেম্বর, ২০১১। রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে কলকাতার ঢাকুরিয়ায় 'আমরি' হাসপাতালের অ্যানেক্স ব্লিডিং-এ ৯৩ জন রোগী অসহায়ভাবে মারা যান। সংবাদ মাধ্যমে একটু পুরেই এখবর প্রচারিত হয়। ইতিহাসে এঘটনা নাকি বেনজির। অ্যাডভান্স মেডিকেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আমরি) - এই হাসপাতালটি গড়ে ওঠে ১৯৯৪-৯৫ সালে। বিগত রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে 'সরকারি-বেসরকারি' উদ্যোগের প্রথম ফসল (স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে)। বিশ্বব্যাঙ্কের ভারতে ঋণের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী এই সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। আমরির বর্তমানে মূল পরিচালক হল শ্রাচি ও ইমামি গোষ্ঠী। ৯০ শতাংশের বেশি মালিকানা এদের। ১.৯৯ শতাংশ মালিকানা সরকারের। সংবাদপত্রগুলি শিরোনামে চিহ্নিত করেছে এভাবেই - 'হাসপাতালেই মৃত্যুপুরী' 'মৃত্যুপুরী আমরি' 'মৃত্যুনিকেতন' 'শ্বাসরুদ্ধ মৃত্যুপুরী' ইত্যাদি। আমরি হাসপাতাল মৃত্যুপুরী হিসেবেই গড়ে উঠেছিল কিনা - কারোর মতে সে বিষয়েও আর কোন সংশয় নেই। খোঁজ করলেই দেখা যাবে, সরকারি-বেসরকারি এই 'স্বাস্থ্যবাজার' তথাকথিত দুর্ঘটনার আগেও অনেক রোগী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ধনেপ্রাণে মেরেছে। এই স্বাস্থ্যবাজারে ঢুকতে পারেন বজজোর দেশের ২০ শতাংশ মানুষ। এঁদের মধ্যে ভারতবর্ষে আবার ফি বছর ২.৫ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন চড়া দামে চিকিৎসা কিনতে গিয়ে (World Bank Report 2004), এখন সংখ্যাটা আরো বেশি। আজকের ব্যবস্থায় চিকিৎসা পরিষেবা মূলত একটি পণ্য। আমরি হল পুঁজি মালিকানাধীন স্বাস্থ্যপণ্যের একটি বড় বাজার। এই বাজারের লক্ষ্য কিন্তু আর পাঁচটা ব্যবসার মতোই - মুনাফা বাড়ানো। আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই যে লাভ করার উপায় এটি অন্যায্য কিনা বা কতটা তা যারা ধরতে পারেন (চুরিটা কি ভাবে হয়) তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। আর একটি ব্যাপার - এই চিকিৎসা বাজারের গড়ে ওঠা, নিয়মকানুন, নিয়ন্ত্রণ, বন্টন ইত্যাদি চালায় চিকিৎসা ব্যবসায়ী অর্থাৎ মালিক এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নানান উপায়ে কিছু সরকারি লোকজন যারা আবার সরকারি জায়গাতেও প্রভাবিত করার মতন অবস্থায় বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু খাতায় কলমে আমরি একটি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান - তাই জনগণ ঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন কিনা তা দেখার দায়ীত্ব কিন্তু সরকারের - এটা সরকার অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ সাধারণতঃ সম্পন্ন মানুষ বা কোনও কোনও সময়ে গরীবমানুষও ঘটিবাটি বেচে এইসমস্ত জায়গা থেকে চিকিৎসা কেনেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে

এই জনগণই সরকারকে নির্বাচিত করেন। কাজেই জনগণ ঠকে যাচ্ছেন কিনা তা বিচারের দায়ীত্ব কার? শুধু আমরি কেন - বহু বেসরকারি হাসপাতল, নার্সিংহোম, ল্যাবরেটরি সরকারি নিয়মকানুন মানে না। সরকারও সেসব খোঁজখবর রাখে না। কী হচ্ছে তা জানতেও চায় না। এমনকি সরকারের নিজস্ব মেডিকেল কলেজগুলিতেও বেআইনি কাজকর্ম চলে আকছার, আমরি হাসপাতল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী জাতীয় বহুতল সুরক্ষাবিধি, জাতীয় অগ্নিনির্বাপক বিধি, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার নিয়মাবলি, রক্ষণাবেক্ষণ প্রণালি ইত্যাদি যে মানেনি, তা জানা যাচ্ছে সংবাদপত্র থেকেই। আমরি কেন বহু বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও মেডিকেল এথিক্স ও আইন মানেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজধানীর বুকের ওপর বসে এইভাবে আইনভঙ্গ করার সাহস এরা পায় কোথা থেকে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে জানতে হবে হাসপাতাল ও সরকারের সম্পর্ক, স্বার্থ ও হাসপাতাল চালানোর উদ্দেশ্যের মধ্যে। মালিকের স্বার্থ মূলত ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বাড়ানো। আর সরকার চায় জনগণের আগেও পুঁজিপতিদের না চটাতে - আর তাই বাধ্য হয় (কিছুটা দর্শনগত দিক থেকেও) তাদের স্বার্থ আর পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের সিস্টেমটাকে টিকিয়ে রাখতে। তাই বেনিয়ম চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। সেই বেনিয়মের ফসলই হল আমরির ৯ই ডিসেম্বর ২০১১'র ঘটনা। সরকার কিন্তু একটি ব্যাপার ঘটিয়েছে, গণবিক্ষোভের আগুন যাতে আমরির মালিকদের গায়ে না লাগে সেইজন্যেই তাদের আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করা হয়। একেবারে রাজকীয় কায়দায়। পুলিশের এসকর্ট ভ্যান নিয়ে মালিকদের গাড়িকে দুপুরবেলায় লালবাজারে নিয়ে আসা হয়। বিকেলে লালবাজারে আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের পর তাঁদরে গোয়েন্দা বিল্ডিং-এ পাঠানো হয়। গ্রেপ্তারের দৃশ্য চ্যানেলে চ্যানেলে দেখানো হয়। এরপরও বিচারের বাণী আসবে কোন একদিন, হয়তো বা। কিন্তু কিভাবে আসবে? স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদেরকে লালচোখ দেখিয়ে? তা কি সম্ভব? তা হলে তার বিকল্প কি? সরকার-ই কি স্বাস্থ্য ও পরিষেবায় সব দায়ীত্ব নেবে আপনা থেকেই? স্বাস্থ্য পরিষেবা মৌলিক অধিকারের অর্ন্তভুক্ত হবে? এমনি এমনি? বর্তমান ব্যবস্থায় কোন সরকারই স্বপ্নেও ভাবে না।

কিন্তু ব্যবস্থাটা এমনই যে আমাদের এমন প্রতিবাদের বদলে অনুনয় চলে, প্রতিরোধের বদলে তদ্বির, প্রতিকার চাওয়ার বদলে পার্টি চ্যানেলে খোঁজ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সরকারি হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থা, উদাসীনতা, অপদার্থতা ও অসংবেদনশীলতা বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসাকেন্দ্রের গগনচুম্বী লোভ ও অসহায় রোগীকে প্রতারণাও আজ মেনে নেওয়া বিষয়-এর বিচার হয় না। আইটিইউ শয্যায় গভীররাতে ঘুমের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু-ভেন্টিলেটরের নল গোঁজা অবস্থায় দমবন্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু, কাঁচ ভেঙে মৃতপ্রায় বৃদ্ধাকে দড়িবেঁধে চারতলা থেকে নামানোর চেষ্টা, রোগিণীদের বাঁচাতে গিয়ে সেবিকাদের পুড়ে মারা যাওয়া - এইসব কিছু একটা শহরে ঘটতে পারে তা বিশ্বাস করা যায় না। তারপর মিডিয়ার বহুবিধ তদন্তে বার হচ্ছে একটার পর একটা কর্পোরেট হাসপাতালগুলির অধিকাংশেরই ভিতরের চেহারাটা এমনই কদর্য। কার পাপে বেসমেন্টে প্রচুর পরিমানে মারাত্মক দাহ্য পদার্থ জমা করে রাখা? কার পাপে ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট রুলকে ন্যুনতম তোয়াক্কা না করে ছোট জায়গায় গাদাগাদি করে অনেকগুলো শয্যা ঢুকিয়ে দেওয়া? চারমাস আগে ফায়ার লাইসেন্স নবীকরণ করিয়ে নেওয়া হয় কার পাপে? পুরসভার একাংশের মদতে 'বিল্ডিং রুল' লঙঘন করে বেআইনি তলা তোলা হয় কার স্বার্থে? খাতায়কলমে দেখানো সত্ত্বেও আগুন নেভানোর কাজে দক্ষ কোন কর্মীর অস্তিত্বই ছিল না আমরি কান্ডে। রাত্রে কোন ম্যানেজারিয়াল স্টাফ না থাকা এবং চিকিৎসক বলতে সব ডিপার্টমেন্টের জন্য জনাকয়েক খেপ খাওয়া জুনিয়র আর.এম.ও. থাকা এবং সেবিকার সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়া - এগুলো কোন জনগণের স্বার্থে? কার পাপে? কার লাভে? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠে এসেছে সরকারে সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চালু থাকা এই হাসপাতাল সম্পর্কে। বিগত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে টোডিদের বেঙ্গল শ্রাচি গ্রুপের চুক্তি বহুবার দাবি ওঠা সত্ত্বেও কোনওদিন প্রকাশ্যে আসেনি। কথা ছিল ১৫% গরিব এবং ৫% সরকারি কর্মচারীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হবে এই প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের শর্ত হিসাবে। বিগত ১৫ বছরে এমন ক'জন রোগী চিকিৎসা পেয়েছেন বা আদৌ পেয়েছেন কিনা, সরকার লভ্যাংশ বাবদ কোটি কোটি টাকা

মুনাফায় চলা এই বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে জুনিয়র পার্টনার হিসাবে কত টাকা রোজগার করেছেন, এসব কোন তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি সরকারের তরফ থেকে। আমরি হাসপাতালে সরকারি অংশীদারত্ব ২৬% থেকে ২% এরও নীচে নেমে আসা, বেসরকারি পুঁজির পরিমাণ ক্রমশ বাড়া, নানা শিল্পপতির প্রবেশ ও প্রয়াণ এবং অবশেষে জনগণের অজান্তেই একদা জনগণের সম্পত্তি 'নিরাময় ক্লিনিক' পাকাপাকিভাবে প্রোমোটার শ্রাচি গ্রুপ ও ইমামি গ্রুপের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যাওয়া। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ যে ২০০৮-০৯ সালে এই হাসপাতালের মুনাফা ছিল ২.০৯ কোটি টাকা যা ২০০৯-১০-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১.১ কোটি টাকা। সরকারি সম্পত্তি উন্নততর পরিষেবার নামে হাতিয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে উঠে এঁরা সল্টলেক ও মুকুন্দপুরে দুটি মেগা হাসপাতাল বানিয়েছে। সেইসব হাসপাতালেও চলছে রোগীদের নানান অজুহাতে আর্থিকভাবে নিঃস্ব করে দেওয়ার সংস্কৃতি, ভুল চিকিৎসা বা অতি চিকিৎসায় মৃত্যু, গুন্ডা লাগিয়ে রোগীর আত্মীয়দের খেদিয়ে দেওয়া, টাকা না পেলে মৃতদেহ আটকে রাখা ইত্যাদি। দীর্ঘদিনের পাপ জমতে জমতে আমরি হাসপাতালে আগুন নিছকই একটি বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়। আমরি ফেঁসে গেছে। কিন্তু ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস রোডের দুধারে উল্টোডাঙ্গা থেকে গড়িয়া পর্যন্ত দুপাশে মালার মতন বেসরকারি হাসপাতাল গজিয়ে উঠেছে। এরা প্রত্যেকেই একই পাপকাজ প্রত্যহ করে চলেছে। একই সংস্কৃতি। একদিকে অর্থবল ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খাটিয়ে অল্পদামে সরকারি জমি ও আনুকুল্য গ্রহণ, সমস্ত ধরনের নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে, রোগীদের নানানরকম প্যাকেজের নামে প্রলুব্ধ করে লক্ষ লক্ষ টাকার ভুয়ো বিল ধরানো, অন্যদিকে উন্নত পরিষেবার কথা বলা, মানবিকতার ধ্বজা তুলে ধরে কর্পোরেট দায়িত্ববোধের গালভরা কথা বলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আসর বাজিমাত করা - এভাবেই রমরম করে চলছে স্বাস্থ্য বাণিজ্য। অবশ্যই সরকারের তরফে পিপিপি মডেলে পরিষেবার উন্নতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত তত্ত্ব খারিজ করা দরকার।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে পি.পি.পি. মডেল

ধীরে ধীরে কয়েকটি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেরও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার চেহারাটা দখল নিচ্ছে বা নেবে বেসরকারি অংশীদারীত্ব। যেমন, তামিলনাড়ুতে এই ব্যবস্থা চলছে। এই তামিলনাড়ু মডেলকেই ধরে পশ্চিমবঙ্গ এগুতে চায়। (তফাৎ হলো এটাই যে তামিলনাড়ুতে পি.পি.পি. মডেল চালু হওয়ার আগে তার নিজস্ব সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেকটাই উন্নত ছিল)। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে এই যে বেসরকারি অংশীদারীত্ব এটা বিগত বাম সরকারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের যে মৌলিক নীল নক্শা - তার হুবহু বরাবর এগোচ্ছে এবং এগোনাটা অনেক দ্রুতলয়ে। পি.পি.পি.-র পক্ষে মতামত তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার (কি আগেরবারের, কি পরিবর্তনের পর এবারের) যে যে যুক্তিগুলো রাখছে তা এরকম ঃ

- এতো বিশাল স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে চালানোর পরিকাঠামো রাজ্যসরকারের একার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতে পারছে না।
- পি.পি.পি. করার ফলে সিটিস্ক্যান বা এম.আর.আই. বা ডায়ালিসিসের চার্জ কমাতে বাধ্য হয়েছে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো।
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের ঢিলেঢালাভাব কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। এহেন উদাসীনতায় সাধারণ মানুষের ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটছে, তাই চিকিৎসায় পেশাদারিত্ব আনার পক্ষে প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে - এসব অনেক কমে যাবে পি.পি.পি. মডেল করলে।

প্রসঙ্গত এগুলো কিন্তু বলা হচ্ছে না যে পি.পি.পি. মডেল আদপে ক্ষতিকারক মডেল কতটা অথবা সরকার নিজেই এই মডেলের ভয়াবহ ভবিষ্যত আঁচ করতে পারছে কিনা। পি.পি.পি. মডেলে যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না - তার কিন্তু নিদর্শন মিলেছে বিগত পি.পি.পি. মডেলের কর্মপদ্ধতি দেখে। আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের বহু শূন্যপদ খালি আছে - বহু জায়গায় নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদনও আছে - টাকাও আসছে। কিন্তু অতীতেও দেখা গেছে সেই টাকা পুরো খরচ হয়নি, ফেরৎ চলে গেছে। বহু আগে থেকে সরকারি পরিকাঠামো অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার স্তরগুলি এরকম ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সাব সেন্টার - ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-মহকুমা হাসপাতাল - জেলা হাসপাতাল - টার্শিয়ারি বা বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল (যেমন মেডিকেল কলেজ)। আদর্শ ব্যবস্থা

হিসেবে এটাই ভাবা হয়েছিল যে একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে রোগীকে রেফার করা হবে পরবর্তী স্তরের হাসপাতালে, এভাবে বিশেষ প্রয়োজনেই মানুষকে দূরবর্তী হাসপাতালে যেতে হতে পারে - না হলে কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে তার চিকিৎসা করে সমস্যা মেটানো যাবে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে এই ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করা যায়নি। তার কারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত অত্যন্ত খারাপ চিকিৎসা ব্যবস্থা অথবা কোন ব্যবস্থাই নেই। সরকার আজ পর্যন্ত কেন এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু একটি নিয়ম করতে পারল না? এর বদলে হবে কি বেসরকারি হস্তান্তরে সুষ্ঠু ব্যবস্থা? তাতে কি পি.পি.পি. মডেলে ব্যবসাটাই মুখ্য হবে না? টার্শিয়ারি মেডিকেল ট্রিটমেন্টের (বিশেষজ্ঞ হাপাতালে চিকিৎসা) জন্য যা যা পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলো যদি প্রাথমিক স্তরে নামানো হয় অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যদি বিশেষ বিশেষ ব্লাড টেস্ট, আলট্রাসাউন্ড, এম.আর.আই. সিটিস্ক্যান নামানো হয় - তাহলে এই মেশিনগুলো বসানোর খরচ তো তুলতেই হবে, লাভও তুলতে হবে - তাই অতি চিকিৎসাও হবে যা অপচিকিৎসারই ফসল বলা যেতে পারে। কেউ কি বলে দিয়েছে যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্শিয়ারি যে ত্রিস্তরীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বিদ্যমান তা বাতিল? তা কিন্তু কেউ বলেনি। গ্রামের গরীব মানুষ কি আর পারবে চিকিৎসা করতে? রেট বেঁধে দেওয়া তো আসলে বাজারের বিশালতাকে ধরে লাভ করার একটা মার্কেটিং প্ল্যান। আর সরকারি কর্মচারীরা ঢিমেতালা - এ অভিযোগ যদি সত্যিও হয় - এটা সারেনা - এটা কিন্তু বিশ্বাসগ্রাহ্য নয়। কাজেই সংশয় থেকেই যায় যে হাসপাতালকে বেসকারি হস্তান্তর করা শুরু করতে চায় বর্তমান সরকার বিগত সরকারের থেকেও আরো দ্রুত লয়ে। কিন্তু নামটা থাকবে পি.পি.পি. - অর্থাৎ সরকারি শিলমোহরে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ।

সম্প্রতি ঝাঁ চক্‌চকে বেসরকারি কর্পোরেট ব্রান্ড ডাক্তার হিসেবে ভারতখ্যাত ডাঃ দেবী শেঠী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন। জেলায় জেলায় সরকারি হাসপাতালে পি.পি.পি. মডেল খুলবার জন্য এর মধ্যেই ওয়েবসাইটে নোটিশ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী এর মধ্যেই পি.পি.পি. মডেল নিয়ে গ্রামে ও জেলায় নতুন ভাবে সরকারি হাসপাতালের সংলগ্ন জায়গাগুলিতে পি.পি.পি. হবে বলেছেন। অনেক হাসপাতালের আইটিইউ, আইসিসিইউ এগুলিও পি.পি.পি. মডেলে হবে। পি.পি.পি. তে হার্ট, ক্যানসার এবং আরো আধুনিক নানান চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে পি.পি.পি. চালানোর জন্য জায়গা দেবে সরকার (বিনা পয়সায়), বাড়ি করে দেবে সরকার (বিনা পয়সায় বা পয়সার বিনিময়ে), গ্রামের মানুষদের জন্য হেলথ্ ইনস্যুরেন্স আনছে সরকার (কিন্তু বিমার পরিসীমা আনলিমিটেড নয় - লিমিটেড। মাত্র ৩০ হাজার টাকা। যার সবটাই খরচ করিয়ে দিতে পারে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থার সংস্কৃতি মাত্র একদিনে। বাদবাকি চিকিৎসা? ঘটিবাটি বেচে?) এরপর রোগী আনার দায়ীত্বটা সরকারকেই নিতে হবে। ওয়েবসাইট নোটিশে গাইডলাইন নেই সরকারের, উল্টে প্রাইভেট এজেন্সীকে বলছে তারা যেন গাইডলাইন ঠিক করে দেন।

দেখা গেছে, যারা চিকিৎসার জন্য বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের মধ্যে চিরদরিদ্র প্রায় ৭১ শতাংশ পরিবার 'বিপর্যয়কারী অভিঘাতে' (Catastrophic shock) আরো তলিয়ে গেছেন। যদি কোন পরিবারের ক্ষেত্রে খাদ্য ছাড়া অন্যান্য মাসিক খরচের (Non food expenses) চল্লিশ শতাংশেরও বেশী চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়, তবে তাকে বিপর্যয়কারী আর্থিক অভিঘাত বলা হয়। আংশিক ঘাটতি ও স্বচ্ছল পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই অভিঘাতের ফলে অর্থাৎ বার্ষিক খরচের ৪০ শতাংশের বেশী চিকিৎসা খাতে চলে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যত্রাক্রমে ৫১ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ; উল্টে সরকারি হাসপাতালে যারা গেছেন তাদের মধ্যে দেউলিয়া হয়েছেন ১৫% থেকে ২০% পরিবার। (সূত্র ঃCatastrophic out of pocket payment for healthcare and its impact on household : Experience from West Bengal : A Report, 2011 : Indian Institute of Health Management)।

National Nutrition Monitoring Bureau প্রায়শই প্রতিবছরেই মাঝেমাঝে একটি সারণী উপস্থিত করে।

সাম্প্রতিক একটি সারণী একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক -

	স্বাস্থ্যসূচক	পশ্চিমবঙ্গ	ভারতবর্ষ	সব রাজ্যের মধ্যে স্থান
১।	শিশুদের রক্তাল্পতা	৭৮%	৭৪%	২৫টি রাজ্যের মধ্যে ৯ নম্বরে
২।	মহিলাদের অপুষ্টি	৬৩%	৫২%	২৫টি রাজ্যের মধ্যে ২১ নম্বরে
৩।	গড় উচ্চতা	১৫০ সেমি	১৫১.২ সেমি	২৩ নম্বরে
৪।	গড় বি.এম.আই. (Body Mass Index)	১৯.৭	২০.৩	২২ নম্বরে
৫।	বি.এম.আই. ১৮.৫ এর নীচে (অপুষ্টির সূচক)	৪৩.৭%	৩৫.৮৯%	২ নম্বরে (অর্থাৎ একটি রাজ্য বাদে সবচেয়ে বেশী অপুষ্টির শিকার পঃবঃ এ)
৬।	মাঝারি ও তীব্র রক্তাল্পতা	৬২.৭%	৫১.৮%	২০ নম্বরে
৭।	মহিলাদের রক্তাল্পতা	৬৩%	৫২%	১৯ নম্বরে

কাজেই এসবের পরেও ধীরে বা দ্রুতলয়ে প্রাইভেটের হাতে চিকিৎসা চলে যাবার পরেও উক্ত সারণী কি আর একটু ভাল হবে? পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যের মান কি আরেকটু উঠবে বলে মনে হয়? প্রাইভেটের হাতে চিকিৎসা মানেই হলো 'রোগী' ক্লায়েন্ট এ পরিণত হয়ে যাওয়া (বিশ্ব ব্যাঙ্কের সংজ্ঞায়) ; অথচ সরকার এর পরেও বিদেশী ঋণও নেবে - আরো ঋণ নেবে বিশ্বব্যাঙ্ক বা ডি.এফ.আই.ডি.-র কাছ থেকে।

সকলের জন্য (গ্রামে) হেলথ্ কার্ড (বীমা) হবে কিন্তু 'সীমা' থাকবে আর সীমা কে অতিক্রম না করে যাবার অধিকার কিন্তু ক্লায়েন্টদের থাকবে না - বরং যারা চিকিৎসা বিক্রী করছে তাদের হাতে থাকবে। খোদ কলকাতা শহরে ভবানীপুর রামরিক হাসপাতাল ও পাইকপাড়ায় একটি মাতৃসদন - এই দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি পি.পি.পি.-র হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেছে রাজ্য সরকার সম্প্রতি। এর প্ল্যান কিন্তু বিগত সরকারই করে গিয়েছিল। কলকাতার হাসপাতালে চাপ কমানোর জন্য। মহকুমা ও জেলা হাসপাতালকে ঢেলে সাজানোর পেছনে পি.পি.পি. গল্পটা রয়েছে এটা ভুলে গেলে চলবে না। ডাঃ দেবী শেঠি শিলিগুড়ি, বোলপুর সহ পনেরটি জেলায় পি.পি.পি. মডেলে হাসপাতাল গড়তে চায় এটা রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে। আপাততঃ ছটি জেলায় কাজ চলবে - হাসপাতাল ভবনটি তৈরী করে দেবে রাজ্য সরকার - এটিও নাকি ঠিক হয়ে গেছে।

আসলে বিশ্বব্যাঙ্ক, ডি.এফ.আই.ডি ও অন্যান্য ঋণদাতা আর্থিক সংস্থাগুলির নির্দেশ অনুযায়ী কাঠামোগত পুর্ণবিন্যাস (structural adjustment) -এর অন্তর্গত কর্মসূচিগুলির বিষয়গুলোকে ধাপে ধাপে রূপায়িত করতে চায় ও সেই কারণেই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের নির্দেশ মতোই ঢেলে সাজাতে চায়। তাই পি.পি.পি. ভাবনাটা বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদর্শিত এক ভাবনা যা হল বিনিয়োগের সামাজিকীকরণ এবং লাভের বেসরকারীকরণ (Socialisation of Investment & Privatisation of Profit)। পি.পি.পি মডেল আফ্রিকাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যেও পি.পি.পি. মডেলের পি.পি.পি. মডেলের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে তার কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। হরিয়ানা, তালিনাড়ুতে বহুদিন যাবতই পি.পি.পি. মডেল বহুলাংশেই বিদ্যমান। কাজেই এটা ভাবা যেতেই পারে যে পি.পি.পি. হল আরও বেশী করে প্রাইভেট - কারণ বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এগুলো সবই বিনাপয়সায় বা নামমাত্র পয়সায় সরকারি বদান্যতায় পাওয়া। এবং ব্যবসার খাতিরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রাইভেট সংস্কৃতিই হচ্ছে লাভ করা আর লাভের জন্য চাই অপ্রয়োজনীয় ও অতি চিকিৎসা। সার্বিকভাবে সরকারি হাসপাতালকে কাজে ও ভাবাদর্শ দিয়ে হেয় করা, দূর্বল করা, উদাসীন করা কর্তব্যের ক্ষেত্রে - এবং ক্রমাগত এটাকে প্রচার করা এবং একটা অশ্রদ্ধা তৈরী করা - এতে কিন্তু, বেসরকারি উদ্যোগই শক্তিশালী হয়। হতে পারে এটাও একটা সাজানো নাটক।

সরকারের উচিত অবশ্যই ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে সরকারি পরিষেবাকে পুনর্গঠিত করা , কারণ মানুষ কেউ সাধ করে চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত হতে চায় না - এর বিহিত হওয়া দরকার।

জানুয়ারী, ২০১২

সাময়িকী

বিষমদের আয়নায়

রবীন মজুমদার

rabinm@rediffmail.com

আমরি হত্যাকান্ড তবু যেটুকু নাগরিক মনোযোগ আকর্ষণ করবে, তার ভগ্নাংশও পাবে না সংগ্রামপুর মগরাহাটের বিষমদ - হত্যাকান্ড একথা জোর দিয়েই বলা যায়। কেনই বা পাবে? অশিক্ষিত ছোটলোক আহাম্মক মানুষগুলো যারা জীবন্মৃতই ছিলো বলা যায়, যারা মাদকাসক্ত, সমাজের উচ্ছিষ্ট, মাতাল হয়ে বৌকে পেটায়, হয়তো সন্তানের পড়াশুনার খরচটুকু বাঁচিয়ে মদ গেলে তাদের অকাল মৃত্যু তো অবধারিতই; একসঙ্গে একেবারে একশো তিয়াত্তর জনের মৃত্যু ঘটেছে বলেই নাহয় খবরের কাগজওয়ালারা হেডলাইন করে দিয়েছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ছোটাছুটি করেছে, কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি করে ফেলেছে, নাহ'লে এ নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কিই বা আছে? ব্যাটাদের আহাম্মকিরও তুলনা হয় না। মদ খেয়ে রাতারাতি এতজন মানুষ মারা গেছে শুনে একজন নাকি তড়পে উঠেছিল - মদ খেয়ে কি মানুষ মরে? একদম বিশ্বাস করিনা, আমি এক্ষুনি খেয়ে দেখাচ্ছি - বলে দৌড়ে ঘরের ভিতর থেকে বোতল বের করে এনে এক নিঃশ্বাসে সবার সামনে গলায় উজার করে দেয় বোতল এবং পরদিন স্থানীয় হাসপাতালে মারাই যায়। রোজই এখানে ওখানে দু-একটা করে মোদো-মাতালের মৃত্যু হয়। একসঙ্গে বেশী হয়ে গেলেই যা ঝামেলা। পুলিশ আবগারী কর্তা, মন্ত্রী সান্ত্রীদের দাপাদাপি; মদের বোতল, ক্যান সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যায়। ভাটি ভেঙে দেয়, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়, ঘরদোরও আস্ত রাখে না। চলে ধরপাকড়, দুচারজনকে থানায় চালান করে দেয়, কেস দেয়। আসল পান্ডারা দু-চার মাস গা-ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিছুদিন পরে সব ঠান্ডা মেরে গেলে সবাই গুটিগুটি পুরোনো কাজে নেমে পড়ে - জীবন 'স্বাভাবিক' হয়ে আসে। রাত বিরেতে সুরেন-ইন্দ্রিস-কালিপদ'র ফ্যাঁসফেঁসে গলায় গান গুমড়ে ওঠে - দে মা আমায় তবিলদারি, অথবা, মনে হয় স্সপ্নে আছি.....

গণমৃত্যু নয় গণহত্যা

বার বারই যেমনটি হয়, এবারেও তেমনই হচ্ছে। চলছে চোলাই মদের ঠেকে হানা, চোলাই ও সাজ সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা, ভেঙে দেওয়া, ধরপাকড়। মূল-পান্ডারা এবারও পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। অবশ্য একটি বিশেষ ব্যতিক্রম আছে। মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের অসহায় পরিবারগুলির সাহায্যার্থে দু-লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। আমরির মৃত রোগীদের জন্য সরকারের তরফে তিন লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবার ঘোষণায় একটু আধটু গুঞ্জন উঠেছিল। এমনকি, মৃতদের পরিবারদের মধ্যে কেউ বা বলেছেন, টাকা চাই না, দোষীদের শাস্তি চাই। কিন্তু চোলাই খেয়ে যারা মরল, তাদের জন্য সরকারী কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার কথা শুনে ক্ষোভ প্রকাশ হচ্ছে রীতিমত, কাগজে চিঠি লিখেও প্রতিবাদ করা হয়েছে - ওরা তো জেনেশুনেই বিষপানে মত্ত হয়েছিল, তাছাড়া এতে কি মদ্যপানকে উৎসাহ দেওয়া হল না? রাস্তাঘাটে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও শোনা যাচ্ছে - গরীব খেটে খাওয়া মানুষরাও তাতে মজা পাচ্ছেন - একে অপরকে হেঁকে বলছেন - মরবি যদি দু-পাত্তর চোলাই খেয়ে মর, পরিবার দুলাখ টাকা পাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর গণতান্ত্রিক ও মানবিক মুখটাই এতে আরও উজ্জ্বল হওয়া উচিত। শুধু আমরির অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন রোগীদের পরিবারের প্রতিই নয়, তাঁর মানবিকতা মৃত মাদকাসক্তদের হতদরিদ্র পরিবারগুলির দিকেও প্রসারিত। আর উৎসাহের কথা যদি বলা হয়, তাহলে তা একদিকে দিয়ে দেখলে মদ্যপানে উৎসাহ দেওয়া যদি মনে হয়, অন্যদিক দিয়ে দেখলে তা আমাদের সমাজের ভালোমানুষদের - জেগে ঘুমনো দের - নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীনদের বা অস্বীকারকারীদের আরও একটু দায়বদ্ধ হতেও উৎসাহ দেওয়া বলে গণ্য করতে হয়। আসলে, চোলাই মদ বা বিষ-মেশানো চোলাই মদের মত বেআইনী অনৈতিক ও প্রাণঘাতী কারবারটা যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখায় আমাদেরও অনেকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িয়ে তো থাকেই। আর তা না থাকলেও সামাজিকভাবে আমরা সবাই এর উস্কানি ও মদতদাতা। এ 'পাপ' আমাদের সকলের। আসুন একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

মাদক-পানীয় আইনী ও বেআইনী

মদ তথা পানীয় অ্যালকোহল সারা বিশ্বের প্রায় সব দেশে মাদকতা বিছিয়ে রেখেছে। 'খাদ্য ও পানীয়' (Food and Beverages) হিসেবেই মদ্য (liquor) পরিগণিত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে, পানীয় মদ্য মোটের উপর তিন রকমের - বিয়ার, ওয়াইন এবং স্পিরিট। পার্থক্য মূলত অ্যালকোহলের (ইথাইল অ্যালকোহল) অংশ পরিমাণে। বিয়ারে যেখানে অ্যালকোহল থাকে 4-6 শতাংশ, ওয়াইনে থাকে 9-16 শতাংশ। সেখানে স্পিরিটে অ্যালকোহলের ভাগ 20 শতাংশের বেশী। সুপরিচিত স্পিরিটের মধ্যে পড়ে হুইস্কি, রাম, ব্রান্ডি, জিন, ভদকা ইত্যাদি। ওয়াইন সাধারণত ফল থেকেই তৈরী-হয় আঙুর, চেরি, আপেল থেকে তৈরী ওয়াইনের বেশ কদর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সমীক্ষা (2004) অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রায় 200 কোটি মানুষ মদ্যপান করেন আর মদ্যপানজনিত নানারকম শরীর-মানসিক বৈকল্যের শিকার হন সাড়ে সাত কোটিরও বেশী মানুষ। 15 বছরের চেয়ে বেশী বয়সের (অনেক দেশেই 15/18 বছর বয়সের নীচে কাউকে মদ্যজাতীয় পানীয় বিক্রি করা আইনে নিষিদ্ধ) সাবালকদের মধ্যে মাথাপিছু বছরে গড় মদ খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। যেমন, অনেকগুলি মুসলিম দেশে-সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী-মাথা পিছু মদ্যপান শূন্য (ইসলামে মদ্য নিষিদ্ধ), যদিও সব মুসলিমদেশে তা নয়। কয়েকটি দেশে এই পরিসংখ্যানঃ ফ্রান্স -13.54 (লিটার, শুদ্ধ অ্যালকোহল, জনপ্রতি/বছরে), রাশিয়া (ফেডারেশন) 10.54 , যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড) 10.39 আমেরিকা - 8.51, জাপান -7.38 , ব্রাজিল -5.32 , চিন 4.45, ভারত - 0.82, পাকিস্থান -0.02 । বলা বাহুল্য এ তথ্য আইনী মদ্য পানীয়ের। সঠিক হিসাব না জানা থাকলেও, একটি সূত্র অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার 5 শতাংশ, সাবালক পুরুষদের 21 শতাংশ এবং নারীদের 2 শতাংশ মদ্যপানে অভ্যস্ত। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার কিছু দেশ যেখানে মাথাপিছু মদ্যপান ভারতের তুলনায় যথেষ্ট বেশী, সেসব দেশে জনসংখ্যার 50-80 শতাংশ (সাবালক) মদ্যপানে অভ্যস্ত।

উপরের সামান্য তথ্য থেকে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে সমাজ অর্থনীতির এক বিশাল জায়গা নিয়ে আছে মদ্যজাতীয় পানীয়। বেআইনী বা আইন বহির্ভূত এবং তাই, তথ্য পরিসংখ্যান বহির্ভূত মাদক পানীয় তাই বলে অপাঙতেয় নয় মোটেই। প্রাচীনতম কাল থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মাদক পানীয়ের চল আছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই স্থানীয়ভাবে সেসব প্রথা টিকে আছে এখনও। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই আছে নিজস্ব মদ্য সংস্কৃতি। আঙুর, আপেল, মহুয়া, তালরস, খেজুররস, কাজু, নারকেল, বার্লি, ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা, রেগি - প্রায় সব ফল ফসল থেকে মাদক পানীয় তৈরীর কলাকৌশল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত আছে। তবে 'সভ্যতা' বিকাশের ঘাত-প্রতিঘাতে পুরনো অনুষঙ্গ প্রায় বিনষ্ট হয়েছে। এখন ভারতীয় মদ্যপ-সমাজ উপর নীচে ভাগ হয়ে গেছে বলা যায়। একদল যারা ক্রমশ বেশী 'সভ্য' হয়ে উঠেছে - যাদের ক্রয়ক্ষমতা উন্নত হয়েছে, হচ্ছে তারা এখন বিলাইতি - আসক্ত, দেশী-শরাবে তাদের মন ভরে না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস বাড়ছে; পয়সায় না কুলোলে বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে সখ হলে তারা দেশী শরাব পরখ করেন ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে থাকে বিলাইতি'র দিকেই (বিয়ার খুবই জনপ্রিয়, জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেচে, হুইস্কি -ভদকা'রও চাহিদা ক্রমবর্ধমান)। এখানে দেশী শরাব তথা কান্ট্রিলিকার বলে যা বলা হচ্ছে তা আইনী দেশী মদ। তার উৎপাদন, বিপনন, গুনমান বজায় রাখা সবই হয় নিয়মমাফিক। সরকারী কোষাগারে এই খাতে মন্দ অর্থাগম হয় না। কিন্তু এর নীচেও আছে মাদকাসক্ত আম-জনতা, তাদেরও মাদক পানীয়ের জোগান আছে, আছে উৎপাদন। গুণমানের বালাই নাই থাক, চটজলদি 'নেশা জমিয়ে দেবার' 'বিপিনবাবুর কারণসুধা, মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধার' চাহিদা - তাও উত্তরোত্তর বাড়ছে - প্রবল। কামে খাস্তা দামে সস্তা স্পিরিট গোত্রীয় (সাধারণত 20 শতাংশের বেশী অ্যালকোহল) এই পানীয়ের জোগানও হাতের কাছেই। বিপণন-পরিচালনাও দক্ষ, একেবারে আধুনিক - ফ্রম প্রোডিউসার ডিরেক্ট টু কনজিউমার। সিক্রেট কিন্তু ওপেন। প্রণামী যেখানে যা দেবার তা অলিখিত সুচারু নিয়মে দেবার ব্যবস্থা করেই শুরু'রা কারবার চালায়। একাংশ পুলিশ, আবগারী অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা বা তার চিহ্নিত হাতা চামচারা তৃপ্ত না হলে এই কারবার চলে না। আইনবিরুদ্ধ

বলেই না এখানে আইনরক্ষকদের কড়া নজর। উপরতলার মদ্যপান আইনবলে সুরক্ষিত, যতক্ষণ না প্রকাশ্য মাতলামি ইতরামি-মারদাঙ্গা তাকে কলুষিত করছে। কিন্তু নীচের তলার মদ্য উৎপাদন-বন্টন-পান সবকিছুই বেআইনী অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলার সমস্যা। পরাধীন ভারতে ইংরেজরা এভাবেই দেখেছিল, ছোটলোকদের মদ-খাওয়াকে। আমরাও এখনও সেভাবেই দেখছি। কিন্তু পারছি না। পারছি যে না, তা স্বীকারও করব না, বাস্তব তথ্য ও সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকব। খোঁড়া বাদশা'দের লাগামহীন লোভের শিকার হতে দেব খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষগুলোকে। আর কিছু না হোক খোঁড়া বাদশা ও তার পার্টনারদের শুধু এইজন্যই কড়া শাস্তি হওয়া উচিত-হবেও মনে হয়-যে মানী উপরওলা'রা তাদের উপর যে আস্থা-বিশ্বাস রেখে কারবার চালাতে দিয়েছিল, তা তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এতগুলো লোক একসঙ্গে মরে গিয়ে মানীদেরও মানহানি ঘটিয়েছে।

মাদক সাম্রাজ্যের বিস্তার

ভারতে বৈধ দেশী মদের বাজার মোট বৈধ বাজারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ, পরিমাণে 24 কোটি পেটি। এক এক পেটিতে 10 টি বোতল, সাধারণত 700 মিলিলিটার। বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাজার বিদেশী মদের দখলে। বিদেশী মদ বলতে আমদানীকৃত এবং দেশেই তেরী। আমদানীকৃত মদ আবার সরাসরি বোতলবন্দী হয়ে আসতে পারে বা ভারতে আসার পর বোতলবন্দী হতে পারে। এদেশে উৎপাদিত বিদেশী মদের (ইন্ডিয়া মেড ফরেন লিকার বা IMFL) উৎপাদনে সামনের সারিতে দুটি কোম্পানি ইউ বি গ্রুপ এবং শ ওয়ালেশ। সবধরণের বিদেশী মদের চাহিদা বাড়ছে - গড়ে বছরে 8-10 শতাংশ হারে। বৈধ দেশী শরাবেরও বাজার বাড়ছে গড়ে বছরে 7 শতাংশ। ভারতে তৈরী সব রকমের বৈধ লিকারের রপ্তানি বাজার প্রায় নেই বললেই চলে।

ভারতের অবৈধ অর্থাৎ তথ্যের আওতার বাইরের মাদক-পানীয় যা নীচুতলার মানুষদের মাদক-তৃষ্ণা মেটাবার প্রধানতম উৎস তার বাজারের পরিমাণ বা প্রসার কেমন? পরোক্ষে অনুমানের চেষ্টা হয়েছে কিছু কিছু। পূর্বোক্ত WHO প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে পান করা মোট মাদক পানীয়ের দুই-তৃতীয়াংশই এই গোত্রের। অর্থাৎ আইনী দেশী-বিদেশী মদের দ্বিগুণ পরিমাণ মদ ভারতীয়রা পান করেন অবৈধ দেশী মদ হিসেবে। অন্য সূত্রে আবার এর পরিমাণ অতটা নয়, মোট মাদক পানীয়ের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ WHO যা বলেছে তার অর্ধেক। তথ্য নেই, যাচাই করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আমরা বোধহয় ধরেই নিতে পারি বৈধ এবং অবৈধ মাদক পানীয় এদেশে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বাজার দখল করে আছে। আনুমানিক হিসেব, ভারতে অবৈধ মাদক পানীয়ের বাজার-টাকার অঙ্কে- 22000 কোটি। এবং তথ্যাভিজ্ঞরা একমত যে অবৈধ মাদক পানীয়ের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান।

মোটামুটি এই চিত্রটাই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে উল্লেখ করা দরকার যে মাদক-পানীয়ের বৈধ বাজার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম। উপরের দুটি রাজ্য মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ। বিহারও আছে পশ্চিমবঙ্গের পাশেই। পশ্চিমবঙ্গে 7টি দেশীমদ উৎপাদক এবং 14টি বোতলজাত করার কারখানা আছে। এদের একটি সমিতিও আছে - ওয়েস্ট বেঙ্গল কান্ট্রি স্পিরিট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড বটলারস অ্যাসোসিয়েশন (WBCSMBA), সবগুলি কারখানাই অবশ্য এদের সভ্য নয়। এরা সবাই সরকারকে শুল্ক দিয়েই ব্যবসা করে। সরকার এদের কাছ থেকে কারখানা পিছু গড়ে বছরে 30-35 কোটি টাকা শুল্ক পান। এ রাজ্যে বৈধ-অবৈধ সব মাদক পানীয়ের জন্যই প্রধান কাঁচামাল হল রেকটিফায়েড স্পিরিট (95.6 শতাংশ অ্যালকোহল থাকে এতে) এবং গুড়। দুটোই আনতে হয় ভিন রাজ্য থেকে (উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখন্ড)। রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন যৎসামান্য। কান্ট্রি স্পিরিট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের রেকটিফায়েড স্পিরিটের চাহিদা মাসে 60 লক্ষ লিটার, এরাজ্যে অবস্থিত একমাত্র ডিস্টিলারি (যারা রে. স্পিরিট উৎপাদন করে) IFB উৎপাদন করে মাসে 15 লক্ষ লিটার। সংগ্রামপুরের বিষমদ হত্যাকান্ডের সূত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তারই একটির সূত্রে জানা যায় যে চলতি 2011 এর জুলাইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রে. স্পি-এর আমদানী-দর বেঁধে দেয় লিটার প্রতি 28 টাকায়, অথচ উত্তরপ্রদেশ সরকার তার রপ্তানী-দর বেঁধে দেয় লিটার প্রতি 31 টাকায়। এই বিরোধে রে স্পিরিটের আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যে যে 1500 দেশী মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান আছে সেগুলি চাহিদা পূরণ করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয় - চোরা বা অবৈধ বাজার এই সময়ে

রমরমিয়ে ওঠে। তাছাড়া বৈধ দেশী মদের আধ-লিটার বোতলের দাম যেখানে 30 টাকা, সেখানে আধ-লিটার চোলাই মদ 20 টাকা বা এমনকি 10 টাকাতেও পাওয়া যায়। সস্তায় নেশা জমানোর ফাঁক দিয়ে ঢুকে যায় ভেজাল, বিষাক্ত করে তোলে পানীয়কে। এই বিবরণে যে কথাটা উনুচ্চারিত থাকে তা হল - ভিন রাজ্য থেকে আমদানীকৃত রে স্পিরিট বা গুড়ের একটা অংশ চোরাপথে নিশ্চয়ই চলে যায় অবৈধ চোলাই কারবারীদের কাছে। কারণ এসব আমদানীর লাইসেন্স পারমিট থাকে শুধু বৈধ উৎপাদকদের কাছেই।

মদের বিষ ও তার উৎস

ভেজাল বা বিষ পদার্থটা কি? সাধারণত তা হল শিল্পের জন্য ব্যবহার্য মেথিলেটেড স্পিরিট - যা তৈরী হয় রে স্পিরিটের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল (9.5% আয়তনানুপাতে), পিরিডিন (0.5%) ও রং মিশিয়ে। মিথাইল অ্যালকোহল রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে পানীয় ইথাইল অ্যালকোহলের সমগ্রোত্রীয় হলেও, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর এর প্রভাব প্রবলতর। তাছাড়া এই বস্তুটি মানবদেহের উৎসেচকের মাধ্যমে সহজেই ফরমেট যৌগতে পরিণত হয় যা শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপে তাৎক্ষণিক বিঘ্ন ঘটায়। প্রাথমিকভাবে মিথাইল অ্যালকোহলে তাই মূহুর্তে 'নেশা জমাবার' ক্ষমতা আছে। কিন্তু মাত্র 10 মিলিলিটার মি. অ্যালকোহল পেটে গেলে অন্ধত্ব এবং 30 মিলিতে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। অবশ্য সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু রে. স্পিরিট নয়, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থে ভরপুর ধুতরো ফলের রসও নাকি মেশানো হয়েছিল। বিষমদের কিছু নমুনা পুলিশ সংগ্রহ করেছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। সেগুলো বিশ্লেষণ করে কি পাওয়া গেল, কি কি ভেজালবস্তু এসব মদে মেশানো হয়? কীটনাশকের মত বিষাক্ত পদার্থও মেশানো হয়েছিল কি না, মৃতদেহের ভিসেরা ও অন্যান্য পরীক্ষা থেকে কি পাওয়া গেল, কোথা থেকে চোলাইমদের কাঁচামালের কতটা জোগান হল এসব বিষয়ে খতিয়ে কে দেখে বা আদৌ দেখে কিনা, কি পদক্ষেপ নেন বা আদৌ নেন কিনা - তা আমরা জানতে পারি না। চাই ও না, কারণ আমরা সবাই সভ্য-ভব্য শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক, মাদকের ধারে পাশে থাকি না।

ছিঃ আমরা ভারতীয়

ভারতে মাদক-পানীয় নিয়ে লজ্জা-সংকোচের অবধি নেই। ভারতীয় সংবিধানও মাদক নিষেধের পক্ষেই - "the State shall endeavors to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purpose of intoxicating dinks"- রাষ্ট্র মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করার প্রয়াস করবে (অনু.47)। intoxicating dinks-এর বাংলা মাদক পানীয় করা ঠিক হল কি না জানি না, কারণ বিদেশে বা দেশে তৈরী আইনী পানীয় হুইস্কি-ভদকা-রাম ইত্যাদিতে যেমন মাদকতা বা নেশা হয়, বেআইনি চোলাইতেও তেমনি হয়। intoxicating শব্দটির মধ্যে toxin বা অধিবিষ কথাটি যেন লুকিয়ে আছে। অতএব শুধুমাত্র মাদক পানীয় নয়, যেসব মাদক পানীয়ে বিষ বা বিষ উপাদান মিশ্রিত থাকবে শুধু সেসবই নিষেধের আওতায় পড়বে। ভারতীয় আইনে সাংবিধানিক সদিচ্ছার এরকম কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু বাস্তব যা, তা হল পয়সাওয়ালারা যেসব মাদক-পানীয় খান তা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু গরীবের মাদক-পানীয়-বিশেষ কিছু ক্ষেত্র বাদ দিয়ে — একদম নিষিদ্ধ। সেসবে বিষ বা বিষ উপাদান থাকতে পারে এই জন্যই কি?

সংগ্রামপুর-মগরাহাটের বিষমদ হত্যাকান্ডের পর ভারতীয় মানক সংস্থা (ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস, BIS) -এর এক কর্তার বার্তা পাওয়া গেল। তিনি জানাচ্ছেন যে, একটা গুণমান ঠিক করে দিয়ে যদি এইসব দেশী মদ সিলকরা ও ছাপ-মারা বোতলে সহজলভ্য করে তোলা যায় তাহ'লে অবৈধ চোলাই-এর ঠেকগুলি আপনা থেকেই উঠে যাবে, বিষমদে মৃত্যুর মর্মান্তিক পরিণতি রোধ করা যাবে। একটা সহজ সত্য প্রকাশ পেয়েছে এই অফিসারের কথায়। অবশ্য এরকম কথা তাঁদের মুখে আগেও শোনা গেছে। কিন্তু তাতে বোধহয় অন্য কারো যাঁরা মাদক-পানীয় বিষয়ক নীতি ও পরিকল্পনা তৈরী করেন, প্রয়োগ করেন - সাড়া মেলেনি। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সরকারী সহজ হিসেব হল - মদ খেতে চাইলে খাও। কিন্তু অন্তত আইনী দেশী মদ খাও, তাতে সরকারেরও আবগারী খাতে আয় বাড়বে। খবরদার বেআইনী ঠেকের দিকে যেও না - আইনরক্ষকরা তাহলে ছেড়ে কথা বলবে না। বাস্তব অত সহজ নয়, সরকারী

আবগারী আয় বাড়ছে ঠিকই, লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানও বাড়ছে খুবই অল্প, চাহিদার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ, তাড়াতাড়ি বেশী বাড়াতে গেলে অন্য নানা অসুবিধা তো আছেই, নীতিবাগীশ কোলাহলও উঠে যায় -পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান করে কি তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত করে তুলতে চাওয়া হচ্ছে? এই কোলাহলের পেছনে নানা রাজনৈতিক দল তো থাকেই- অন্তত সামনে, কিন্তু পেছনে ঘুষখোর দুর্নীতিগ্রস্ত আবগারী কর্মী-পুলিশদের এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও মদত থাকে। কারণ চালু ব্যবস্থায় তারই ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশী লাভবান। তারা জানে আবগারী খাতে সরকারী আয় যতক্ষণ কমে না যাচ্ছে বা স্বাভাবিক বৃদ্ধিটা বজায় থাকছে ততক্ষণ ধরপাকড় রেইড না করলেও চলবে, রুটিনমাফিক কিছু কেস দিলেই হল। অর্থাৎ একই সঙ্গে গাছেরও খাবার তলায়ও কুড়োবার বন্দোবস্তটাই তারা পাকা রাখতে চায়; সরকারী আবগারী নীতি ও আইন তাদের সেই সুযোগই করে দেয়।

সাংবিধানিক সদিচ্ছা মেনে ভারতে মাদক-পানীয় পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয় কেন? সম্ভবত এই কারণেই যে তা বাস্তবোচিত নয়। পৃথিবীর বহু দেশ বিভিন্ন সময়ে সেরকম প্রয়াস করেছে। ফল কি হয়েছে? সীমান্ত দিয়ে মদের চোরাই আমদানী সাংঘাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে বেড়েছে নানাবিধ অপরাধ এবং খুন-জখম-ধর্ষণ। ভারতেও বিভিন্ন রাজ্য পরখ করেছে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান গুজরাটে 2009 সালে রাজ্যে যখন মাদক-পানীয় পুরোপুরি নিষিদ্ধ - বিষাক্ত বেআইনী মদ খেয়ে মারা পড়েছিল 136 জন। ঐবছরই কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুতে একইভাবে মৃত্যু হয়েছিল 170 জন মানুষের। অবশ্য উল্টো সংবাদও আছে-দেশী মদ নিষিদ্ধ করে মহারাষ্ট্র নাকি দারুণ সুফল পেয়েছিল। এক বছরে সরকারের আয় যেমন লাফিয়ে বেড়েছিল, তেমনি বৌ-পেটানো অপরাধ কমে গিয়েছিল এক-তৃতীয়াংশ। তবে এই সুফল স্থায়ী করার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্র দেশী মদ নিষিদ্ধ করার নীতিতে অবিচল থাকেনি, আর সুফল-কে আরও উপরের দিকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে রাজ্যকে পুরোপুরি 'শুকনো' রাখার পথেও হাঁটেনি!

অ্যালকোহল উৎপাদনের মূলকথা

সরলভাবে দেখলে, বিশ্বজুড়ে মাদক-পানীয় তৈরীর মূল প্রক্রিয়া মাত্র দুটি - সন্ধান (গাঁজানো/পচানো) এবং সন্ধানের পর পাতন (fermentation and distillation)। বড় কারখানাতেই হোক বা পর্ণ কুটিরে, উৎপাদনের ভিত্তি এই-ই। ফল বা শস্যের মধ্যে বা চিনি/গুড়ে থাকা শর্করা পদার্থ (স্টার্চ চিনি গ্লুকোজ ইত্যাদি) ছত্রাক-জীবাণু ইস্টের সাহায্যে ইথাইল অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয়। মিশ্রদ্রবণের মধ্যে ক্রমশ অ্যালকোহলের ভাগ বাড়তে থাকলে একসময় ইস্টের বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে যে বাষ্প তৈরী হয়, তাকে শীতকের সাহায্যে ঠান্ডা করলে প্রথম দিকে 95.6 শতাংশ অ্যালকোহল ও 4.4 শতাংশ জলের মিশ্রণ পাওয়া যায়। একেই বলে রেকটিফায়েড স্পিরিট। বলা বাহুল্য, ক্রমাগত তাপ দিতে থাকলে জলীয় বাষ্পের ভাগ বাড়তে থাকে।

অধিকাংশ চোলাই-মাদকই পাতিত স্পিরিট। মূল প্রক্রিয়ায় অভিন্ন হলেও কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল, ব্যবহৃত জল ইত্যাদির নির্দিষ্ট গুণমান যাচাই করে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, তাপমাত্রা ও সময় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্ধান প্রক্রিয়া ও পাতনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত শর্ত পালনের চেষ্টা করা হয়। চোলাই তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতি পদে শর্ত লঙ্ঘিত তো হয়ই, তাছাড়া নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দূষিত জল বা পাত্র ইত্যাদির ব্যবহার এবং সন্ধান-ক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য মেশানো নানারকম পদার্থ (মাত্রাতিরিক্ত নিশাদল ব্যবহারের চল খুবই) তৈরী পানীয়কে বিপদসঙ্কুল করে তুলতেই পারে। এর পরেও থাকে ভেজাল।

শিল্পেরও মহার্ঘ রাসায়নিক ইথাইল অ্যালকোহল

শুধুমাত্র মাদক পানীয়ের প্রধান উপকরণ হিসেবেই নয়, শিল্প-স্বাস্থ্য-গবেষণার জন্যও ইথাইল অ্যালকোহল মহার্ঘ রাসায়নিক। ইদানিং মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসেবেও তার চাহিদা প্রচুর। পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে - মিশ্র জ্বালানী গ্যাসোহল যেমন উৎপন্ন হতে পারে, তেমনি সরাসরি রেকটিফায়েড স্পিরিটও মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। পেট্রোরাসায়নিক শিল্পে যা কিছু উৎপন্ন হয়, যেমন প্লাস্টিক, ওষুধপত্র, কীটনাশক ইত্যাদি, তারও বেশীর ভাগই সহজে তৈরী করা যেতে পারে ইথাইল অ্যালকোহলকে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। যদিও এপথে পৃথিবীর কোন দেশই এখনও জোর দেয়নি কারণ এখনও পেট্রোলিয়াম লভ্য এবং ইথাইল অ্যালকোহল এখনও

অন্যান্য শিল্প চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে পেট্রোরসায়নশিল্পের পরিবর্তে ইথানল-রাসায়নিক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতে অবশ্য ইথাইল অ্যালকোহল তথা ইথানলের উৎপাদন খুবই সীমিত, মাত্র 200 কোটি লিটার বছরে। মোটামুটিভাবে এর অর্ধেকই চলে যায় মাদক পানীয় খাতে। বাকী অর্ধেক দিয়ে শিল্পচাহিদা মেটে না। বছর দুই আগে ভারত সরকার পেট্রোলের সঙ্গে 10 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী তৈরীর কথা ভেবেছিল (এখন 5 শতাংশ মেশানো যায়), কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি জোগানের ঘাটতিতে। গ্যাসোহলের উৎপাদনের লক্ষ্যে চিনিকল কে পাতিত অ্যালকোহল তৈরীর জন্য 'ইন্টিগ্রোটেড সুগার প্ল্যান্টস উইথ ডিস্টিলিং ফেসিলিটিজে' উন্নীত করার চেষ্টা কিছুটা হলেও, উল্লেখযোগ্য ফল এখনও পাওয়া যায় নি।

বিশ্বায়নের মাদকতা, মাদকতার বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের ছোঁয়া লেগেছে মাদক-পানীয়তেও। মাদক-উন্নয়ন চিন্তায় সরকার পিছিয়ে নেই। বিয়ার ও অন্যান্য কয়েক প্রকার মাদক-পানীয় বিক্রির ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদারীকরণ নীতির প্রয়োগ চলছে। এইসব মাদক-পানীয়ের আমদানী শুল্ক অনেকটাই কমানো হয়েছে। ডায়াজিও, অ্যালায়েড ডমেক, পার্নো রিকার্ড ইত্যাদি পৃথিবীখ্যাত মদ্য উৎপাদকদের নাম এখন ভারতীয় রসিকদের কাছে অপরিচিত নয়। দেশী কোম্পানীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তারা হাজির হয়েছে ভারতের বাজারেও। এমনকি ভারতীয় বাজারে সরাসরি লগ্নিতেও (FDI) তারা উৎসুক। খুচরো মদের বিপননে মুখিয়ে আছে বহুজাতিক বৃহৎ কারবারীরাও। স্বভাবতই এই বাজারে 'চুল্লু' অচ্ছুৎ। চুল্লু তার যাবতীয় বিষাক্ত অনুষঙ্গ নিয়ে নেশার নিজস্ব সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলে আলো-ঝলমলে বৈধ আসরের আবছায়াতে।

চোলাই-চুল্লু-বিষমদ, তাই, ভারতীয় সামগ্রিক মদ্য-সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যতই তা অবৈধ হোক, যতই আমরা তাকে না দেখার ভান করি, উপেক্ষা অবহেলা ঘৃণা দিয়ে যতই আমরা তাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি, সে ছিল, আছে, থাকবে। বৈধ অংশের সঙ্গে তারও বাড়বাড়ন্ত হবে। এই সত্যকে সহজভাবে মেনে নিলে বিষ-সমস্যার সমাধানে একরকমভাবে এগোনোর পথ পাওয়া যেতে পারে। আর এ সত্য না মানতে চাইলে, ঔপনিবেশিক শাসকের দৃষ্টিভঙ্গীতে চোলাই-সংক্রান্ত সবকিছুকে নিছক আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখলে সংগ্রামপুরের মত হত্যাকান্ড ঘুরে ফিরে হতেই থাকবে। যেমন বহুবার হয়েছে এর আগেও। এ তো নিছক মৃত্যু নয়, এ হত্যাকান্ডই, আর তাতে বৈধ নেশাখোর আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সভ্য-ভব্য নিরাসক্তদেরও পরোক্ষ ভূমিকা অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

কী-ই বা করতে পারতাম আমরা

পারতাম অনেক কিছুই যদি আমাদের সেই সততা ও সচেতনতা থাকতো যা দিয়ে নিজ-দেশের প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা জানবার বোঝবার প্রয়াস করা যায়, সমস্যা সমাধানে এগোনো যায়। এমনকি এরাজ্যেও, দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাম শাসন সত্বেও, এই নিষ্ঠুরতার, নিরাসক্ততার অভিমুখ এতটুকু বদল হয়নি।

এইসব মানুষের মাদকাসক্তি, চোলাই-পান আনুষঙ্গিক আরও নানাধরণের প্রবণতা নিয়ে সমীক্ষা-অনুসন্ধান গবেষণা হয়েছে কি কিছু? চোলাই মদ তৈরী, তার বিজ্ঞান তার কারিগরী তার ব্যবস্থাপনা তার কাঁচামাল, মূলধন, বিপণন সবকিছু নিয়েই গবেষণার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। কিন্তু আমাদের গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীরা হন্যে হয়ে গবেষণার ক্ষেত্র খুঁজে ফেরেন বিদেশী জার্নালের পাতায়, অথবা গবেষণা অনুদান যাঁরা দেন সেই সব সরকারী সংস্থার নির্দেশিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রের তালিকায়। দেশের যেখানে প্রয়োজন সেখানে গবেষণার অনুদান নেই। অতএব গবেষণাও নেই! বৃহত্তর সমাজও আশ্চর্য নীরব!

বিষমদ সমস্যা এক বৃহৎ সামাজিক সমস্যা, এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি সমস্যাও বটে। ভারতীয় মানক সংস্থার সেই প্রবক্তা ঠিকই বলেছেন - একটা গুণমানের স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া দরকার। একমাত্র বৈধতা প্রদানের পথেই তা সম্ভব। একথা তো অনস্বীকার্য যে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত একদল মানুষ- সংখ্যা তার কম নয় - বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ন্যুনতম পাঠ না নিয়েও অ্যালকোহল তৈরীর মূল ব্যাপারগুলিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল। এঁদের এই বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতাকে আমরা কি কাজে লাগাতে পারি না? মহল্লায় মহল্লায় সেরকম মানুষগুলিকে নিয়ে কো-অপারেটিভ তৈরী করে নির্দিষ্ট গুণমানের পানীয় তৈরীর ও বিপণনের ব্যবস্থা করা

যায় না কি? সরকারকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, তদারকিও করতে হবে। উৎপাদনের মান ও পরিমাণে নজর রাখতে হবে, প্রয়োজনে কিছু যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সাহায্য দিতে হবে। আইনকে দেশের সমস্ত মানুষের প্রতি সমদর্শী করে তুলতে হবে। এক শ্রেণীর নাগরিককে পানে উৎসাহ দেওয়া আর অন্য শ্রেণীর নাগরিকদের পান বেআইনী - এই অবাস্তবতার অবসান ঘটানো দরকার। মাতলামি ও শান্তিভঙ্গ করার ক্ষেত্রে আইন কঠোর হোক সবার জন্য। খাদ্যে, ওষুধে ইচ্ছাকৃত বিষ-মেশানোর সর্বক্ষেত্রে কঠোরতম শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু করা যায়, উদারতার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার অনুকুলে যদি এভাবে আমরা মানুষের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করতে পারি, তাহলে মদ্যপানের কুফলগুলি সম্পর্কেও তাদের আমরা সজাগ করে দিতে পারবো, নিশ্চয়ই পারবো বোঝাতে যে মদ্যপান আর মাদকাসক্তি এক নয়, নেশা করা আর মাতলামি করা এক নয়। যে পরিবারগুলি রাতারাতি রোজগেরে পুরুষশূন্য হয়ে গেল, সেইসব পরিবারের মহিলারাও এই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি। আসল কথা হল - তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা। দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, নিজেদের ক্ষমতা-দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে জীবনের আস্বাদ নেওয়া। সেখানে কিছু করতে চাইলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনকে, তাদের অভ্যাস আচরণ ও বিদ্যাকে গভীরভাবে অনুশীলন করতে হবে।

দেশে দেশে বিভিন্ন অখ্যাত, লৌকিক চর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্বখ্যাত হয়ে গেছে কতরকম মাদক-পানীয়। আমাদেরই গোয়ার 'ফেনি' এখন ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের (Geographical indicator-এক ধরণের স্বত্বস্বীকৃতি) মর্য্যাদা পেয়েছে। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানীরা নানা গুণগান করবেন, সৃষ্টির অনুপ্রেরণার জন্য মাদক-পানীয়ের শরণ নেবেন, পানীয় মদ্যের সমস্যা সমাধানে লুই পাস্তরের মত মহাবিজ্ঞানীও গভীর মনোযোগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন, মাতাল গিরিশ ঘোষও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-ধন্য হতে পারবেন - কিন্তু আমরা পারব না আমাদের মাটির দিকে মানুষের দিকে তাকাতে?

যদি আজও আমরা তা করতে পারি, তবে আজকের চোলাই-ঠেকগুলি কালকে ছোট ছোট যৌথ মালিকানার কারখানায় রূপান্তরিত হতে পারে; ক্রমশ, তবুও, নেশাখোর মাতালের সংখ্যা কমে যেতে পারে। উৎপাদিত অ্যালকোহলকে আরও বেশী করে শিল্পের দিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও বেশী ইথানল-যুক্ত গ্যাসোহল পাওয়া যেতে পারে, যা পেট্রোলিয়াম আমদানীর বিপুল খরচ কমাতে পারে। নিরন্তর প্রয়াস, নিরন্তর গবেষণা অবশ্যই প্রয়োজন। চাই কি অদূর ভবিষ্যতে হাজার হাজার এইসব কারখানায় তৈরী ইথানল দিয়ে প্লাস্টিক, ওষুধ ইত্যাদির বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের কথাও ভাবতে পারি। বিজ্ঞান-কারিগরীর নিজস্ব ভিত গড়ে তোলার এমন পথই প্রমাণিত শ্রেষ্ঠ পথ। আমদানীকৃত শিক্ষা-গবেষণা-শিল্প সবই আখেরে কুফলদায়ী হয়ে ওঠে, যদি না নিজেদের জীবনচর্চার মাধ্যমে নিজেদের চিনতে জানতে শিখে সেগুলোর আত্মীকরণ করতে পারি।

পারবো কি আমরা এতদিনের অভ্যাস পালটে নতুন এই অভিমুখ তৈরী করতে? এ রাজ্য কি পারবে ভারতকে একটা নতুন পথ দেখাতে? মাদক-পানীয়ের ব্যাপারে রাজ্যেরও অনেক কিছু করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে। মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা কি একটা সদর্থক বাস্তব পরিবর্তনের পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে সমস্ত কায়েমী স্বার্থের বাধা অতিক্রম করে?

চোলাই ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

শুভব্রত নিয়োগী

আবার চোলাই মদে গণ মৃত্যু। ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল থেকে শুরু হল মৃত্যুর মিছিল। এ পর্যন্ত ১৭৩ জন মানুষ মারা গেছেন। যারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মগরাহাট-সংগ্রামপুরের বাসিন্দা। অসুস্থ হয়ে বেঁচে যাওয়া কুড়ি জন মানুষ অন্ধ হয়ে গেছেন 'বিষ মদ' -এর প্রভাবে। রাজনৈতিক দোষারোপ পর্ব চলেছে অতঃপর। নজির বিহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মৃত মানুষদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। চোলাই মদের মত নিষিদ্ধ মদ খেয়ে মরল যারা, সেই মানুষরাই তো 'দোষী' - তাদের জন্য আবার সরকারি তহবিল থেকে এত টাকা খরচ করা কেন, এমন কথাও আলোচিত হয়েছে পথে ঘাটে। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হয়েছে এমন সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে। চোলাই মদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় পদযাত্রা হয়েছে। এখানেও এসেছে দোষারোপের পর্ব - তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই এই চোলাই মদের বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়েছে বিগত ৩৪ বছর ধরে এমনটাই অভিযোগ। এসবের শেষে, আমরা জানি, চোলাই ছিল-চোলাই আছে-চোলাই থাকবে - সুতরাং আবার কোন দিন, আবার কোনও মহল্লায় গরীবগুর্বো মানুষ ও ইঁদুরের মত ছটফট্ করে মরে যাবে দলে দলে - এ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

চোলাই ও তার উপভোক্তাগণ ঃ চোলাই এর অনেক নাম, যেমন চুল্লু, পচুই, পচাই। নিষিদ্ধ - কারন এটা সরকারের আবগারি দপ্তর অনুমোদিত 'দেশি মদ' বা 'কানট্রি লিকার' নয়। 'দেশি মদ' - কে সাদা বাংলায় 'বাংলা' বলা হয়। 'বাংলা' মদ তৈরি হয় রেকটিকায়েড স্পিরিট থেকে - যা তৈরী হয় অনুমোদিত ব্রিউয়ারি, ডিস্টিলারী তে। বাংলা মদের উৎপাদন, বোতলিকরন, বিপনন পুরোটাই রাজ্য আবগারি দপ্তরের নিয়ন্ত্রনে। বাংলা মদ বিক্রির জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান আছে - তাদের সংখ্যা এত কম যে চোখেই পড়ে না। আর আছে 'বার' যেমন 'খালসিটোলা' 'বারদুয়ারি'। এই সব দেশি বারের সংখ্যা আরও নগন্য। দেশি মদ বা বাংলা মদ পানীয় হিসাবে নিরাপদ। কারন সেখানে মান যাচাই করার ব্যবস্থা আছে তবে দাম কম। ৬০০ মিলি বোতলের দাম বর্তমানে ৪৬ টাকা। বোতল ফেরত দিলে ৪টাকা ফেরত পাওয়া যায়। 'দাম কম' কথাটা অবশ্য আপেক্ষিক। ভদকা, হুইস্কি নিদেন পক্ষে রাম-এর মত 'বিদেশী মদ' তা দেশে তৈরী হলেও, 'বাংলা'র থেকে অনেক বেশি মহার্ঘ।

আবার 'বাংলা' মদ খেয়ে নেশা করা যাদের কাছে বিলাসিতা, তারাই হল চোলাই মদের উপভোক্তা। সুতরাং মদের মাপকাঠিতে সমাজের অর্থনৈতিক স্তর বিভাজন করা যেতে পারে।

বিশেষ বিশেষ দিনে বাংলা মদের উপভোক্তারা যেমন 'বিলিতি' পান করে সেলিব্রেট করেন, চোলাই ভোক্তারা তেমনই খান 'বাংলা' - সীল করা, বোতলজাত মদ। যা রোজ কিনে খাওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে।

মদের জাত বিচার ও আবগারী দপ্তর ঃ আমাদের দেশে বহু প্রাচীন সময় থেকেই ঘরে ঘরে মদ তৈরী হয়ে আসছে প্রধানত আদিবাসীদের মধ্যে। এই মদ উৎপাদন হয় নিজস্ব দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য। সাঁওতাল, ওড়াঁও, মুন্ডারা তৈরী করেন। ভাত জাত মদ যা বা যেগুলি হাড়িয়া, ডিয়ং, রসি নামে পরিচিত। মহুয়া থেকে উৎপন্ন মদ ঝাড়খন্ড, ছত্তিসগড়, মধ্যভারতের কিছু এলাকা ও পশ্চিমবঙ্গের অষ্ট্রীক আদিবাসীদের মধ্যে আদিকাল থেকে প্রচলিত এবং পবিত্র বস্তু হিসেবে মান্য।

পার্বত্য উপজাতিরাও ভাত বা যব জাতীয় শস্য গাঁজিয়ে গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে এক প্রকার মদ বানায়, তাকে বলে সাং বা ছাং।

এই সব গৃহস্থালীতে প্রস্তুত ও নিজস্ব ব্যবহার্য্য মদ বে-আইনি নয়। আর আছে তাড়ি, - যা তাল বা খেজুর রস থেকে উৎপন্ন হয়। বাংলার গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষ-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে-তাড়ি পান করে চলেছে বহুকাল ধরে।

যেহেতু সংস্কৃতি বা লোকজীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত এই সব পানীয়, যা সীমিত ভাবে, স্থানীয় পদ্ধতিতে এবং সীমিত সংখ্যক মানুষের জন্য উৎপাদিত হয়, তা আইনত নিষিদ্ধ নয়। তবে এ বিষয়ে বিধি নিষেধ আছে। অবাধ উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। সংশ্লিষ্ট আইনটির নাম 'বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট

১৯০৯'। বহুবার সংশোধিত হয়েও এই আইনই বলবৎ আছে। রাজ্য আবগারী দপ্তরের প্রধান আইনি ভিত হল এটি। এই আইন অনুযায়ী তাড়ি ও পচুই (চোলাই) এর সংজ্ঞা হল ঃ

Tari : tari means fermented or unfermented juice drawn from any Coconut, Palmyra, Date or other Kind of Palm tree.

Pachwai : "Pachwai" means fermented rice, millet or other grain, whether mixed with any liquid or not and any liquid obtained therefrom, whether diluted or undiluted, but does not include beer.

গৃহে প্রস্তুত মদ ও তাড়ি ব্যবহার ও উৎপাদনের বিধিনিষেধ ঐ আইনের ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, এবং ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে। সেসব বিস্তৃত আলোচনা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবে ২১ নং ধারাটি রসিক পাঠক উপভোগ করবেন বলে পুরোপুরি 'কোট' করছি—

Manufacture and sale of liquor in or near cantonments : Within the limits of any military cantonment, and within such distance from those limits as the central Government may in any case prescribe, no licence for the manufacture or sale of liquor shall be granted except with the previous consent of the commanding officer. অর্থাৎ সেনা ছাউনির ত্রিসীমানায় মদ তৈরী বা বিক্রি নৈব নৈব চ, যদি না সেনাধ্যক্ষের আগাম অনুমতি থাকে।

যা হোক, গৃহে প্রস্তুত মদিরা এবং তাড়ি সরকারের আয় বাড়ায় না। আগেই বলেছি চোলাই বা পচুই একে বারে নিষিদ্ধ। সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারই নেই চোলাই 'শিল্প' থেকে। সরকারের রাজস্ব আদায় হয় চার প্রকার মদ্য থেকে। প্রস্তুতি থেকে বিপননের বিভিন্ন স্তরে স্তরে। সেগুলো হল ঃ

১। দেশি মদ বা কান্ট্রি স্পিরিট
২। দেশে প্রস্তুত বিদেশি মদ
৩। বিদেশে প্রস্তুত, দেশে বোতলজাত, বিদেশি মদ।
৪। বিদেশে প্রস্তুত ও বোতলজাত, আমদানীকৃত বিদেশি মদ।

মদ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসেব দেওয়া হল ঃ

আবগারী রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধির হার

	সাল	রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)	বৃদ্ধির হার (%) (আগের বছরের তুলনায়)
১।	২০০৩-০৪	৬১,৬৮২.৩৫	৮.৭৫
২।	২০০৪-০৫	৬৬,৮২৯.০৭	৪.৭৫
৩।	২০০৫-০৬	৭৪,৯৮৪.১৯	১২.২০
৪।	২০০৬-০৭	৮৩,৫৫৭.০১	১১.৪২
৫।	২০০৭-০৮	৯৫,০০৪.৬০	১৩.৭১

অর্থাৎ উন্নতি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলির হিসেবে আরও আশাব্যাঞ্জক সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটা বেসরকারি সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হচ্ছে 'হার্ড ড্রিঙ্ক' (কড়া মদ্য) সেবনে ভারতীয়রা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করছে। ইউরোপের বহু দেশের থেকে কড়া মদ্য সেবী মানুষের হার ভারতে বেশি। রাশিয়ার প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে এই দেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হুইস্কি সেবী দেশ ভারত। ভারতীয় ভদকার মান বেশ ভাল এবং এর চাহিদাও ক্রমবর্ধমান।

দামি মদ থাক্। চোলাই নিয়ে আলোচনায় ফেরা যাক।

চোলাই-এর অলিগলি ঃ সন্ধ্যা। ঢাকুরিয়া, বাঘাযতীন বা বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে রেল লাইনের ধারে একটু অন্ধকার কোণে ক'দিন আগেও সন্ধান করলে দেখা পাওয়া যেত চোলাই-এর ঠেক্। একটু 'গোপেন' কিন্তু 'ওপেন'। পলিপ্যাকে ভরা ঘোলাটে তরল। দাম ৫ থেকে ২০ টাকা প্রতি প্যাকেট। পান করার অভিজ্ঞতা হয়নি বলে স্বাদটা জানি না। তবে বাংলার-র থেকেও বিস্বাদ ও বদ গন্ধ যুক্ত বলে অনুমান করা যায়। পশ্চিম বাংলার গ্রামে গঞ্জে, হাটে, বাজারে

চোলাইয়ের একটা বিক্রয় কেন্দ্র থাকবেই। একটু আড়ালে, একটু ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে চোলাই-এর জ্যারিকেন বা প্যাকেট নিয়ে বসে থাকে বিক্রেতারা। বিক্রেতাদের কাছে চোলাই আসে এজেন্টদের মাধ্যমে, যাদের অনেকেই মহিলা। মদের ভাঁটিগুলো কোনও মহাশূন্যে বা অতল জলের গভীরে অবস্থিত নয়। কোনও গ্রামে, কোনও মফঃস্বলের মাটিতেই তাদের উপস্থিতি। তাদের অস্তিত্ব যেমন জানে গ্রামের রাজনৈতিক মাতব্বরেরা তেমনি জানে পুলিস, আবগারি দারোগা ও সেপাই। আবার তারা 'জানেনা'। জানতে পারেনা কারণ জানলেই তো ব্যবস্থা নিতে হয়। ব্যবস্থা নিলে টাকার আমদানি বন্ধ। একটা 'বেআইনি' জিনিষ থাকলে ব্যাপারটা কতটা লাভজনক তা সরকারি স্তরে সকলেই বোঝে। 'বেআইনি' টা আইনি হয়ে গেলে 'ঘুষ' দেবে কে?

আবার এর একটা অন্য দিকও আছে। বিশাল সংখ্যক জনগনের চাহিদা। তার চাপ। এই মদ্যসেবী জনগণ চোলাই না পেলে বিরাট অসুবিধায় পড়বেন। 'বাংলা' কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। মদ্যপান বিরোধী প্রচার চালানো হয়েই থাকে। অতীতে সমাজ সংস্কারকরা, ধর্ম ও রাজনীতি প্রচারকরা মদ্যপান বিরোধী প্রচার কী কম করেছেন? তাও মদ্যসেবী মানুষের সংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত তাও প্রশ্নাতীত নয়। এটা মূলত একটা পিউরিটান, নাকউঁচু, আন্দোলন। মদ্যসেবী কেউ যদি সামাজিক ঝঞ্ঝাট পারিবারিক সমস্যা না ঘটায়, তবে তার মদ্যপানের অধিকার বন্ধ করার গার্জেন হতে যাওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। মদ্য পানের সমর্থন বা অসমর্থন করার থেকে দেখা দরকার মদ যেন বিভিষিকা না হয়। ব্যাপক স্বাস্থ্য হানি বা মৃত্যুর কারণ না হয়। তারপর ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর ছড়াটাই বিচক্ষণ সমাজের পরিচায়ক। মদ বিরোধী সব প্রচার দেখা যায় গরীব মহল্লায়, তাদের আমরা নীতিকথা শোনাতে যাই বারবার। দামি বিলিতি মদে আসক্ত সম্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জ্ঞান দান করতে তো দেখিনা কাউকে। মোট কথা যে দামেই কিনুক, মদ খেয়ে তাকে মরতে হবে কেন? নিষিদ্ধ মদ খেয়ে মরেছে বলে তার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে পারেনা সমাজ এবং সরকার। সুতরাং বর্তমান সময়ের এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরন দেবার যে ঘোষনা মূখ্যমন্ত্রী করেছেন তা গভীর তাৎপর্য্য বহন করে। এর মধ্যে তাঁর সামাজিক দৃষ্টি ও গরীব মানুষের প্রতি আন্তরিক মমতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কোনও বিকল্প আইনসিদ্ধ সস্তা মদের ব্যবস্থা না রেখে চোলাই বন্ধের প্রচার যদি তাঁর সরকার করে চলে তবে তার ফল হবে শূন্য। 'দেশি মদ' বা 'বাংলা' আর একটু কম দামে বিক্রি করে আর ঐ মদের সরবরাহ বাড়িয়ে চোলাই ব্যবসাটাই অর্থনৈতিক ভাবে বাতিল করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হল না কেন? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে তো যে রাজস্ব 'ঘুষ' হয়ে নেতা, পুলিস ও সরকারি লোকেদের পকেটে ঢুকছে তা সরকারি কোষাগারে জমা হত। সরকার পরিচালকরা এটা বোঝেনা, তা হতেই পারেনা। কিন্তু এটা তারা করছেন না কেন? সেইটা আবার আমরা বুঝতে পারছি না।

সম্ভাবনা ঃ দেশি মদ ঃ বায়ো ডিজেল ঃ সরকার বাহাদুর কী করবেন তিনিই ঠিক করুন। কিন্তু দেশি মদ তৈরির পর্যাপ্ত উপাদান, প্রকৌশল ও সামাজিক প্রচলন থাকা এই রাজ্যে চোলাইকে সমস্যা না ভেবে সম্ভাবনা হিসেবে দেখাটাই আজ বাস্তব সম্মত।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিলের কথা বলে নিতে হবে। মদ বা অ্যালকোহল থেকে জ্বালানী তৈরিতে ব্রাজিলের তৈরি অ্যালকোহল এখন বিশ্ব বাজারের অর্ধেকের বেশিটাই দখল করে রেখেছে। ইথানল জ্বালানী উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। একটা পরিসংখ্যান বলছে ব্রাজিল ও আমেরিকা মিলিত ভাবে ২০১০ সালে ইথানল জ্বালানীর ৮৭.৮% উৎপাদন করেছে। ব্রাজিলে শস্য থেকে মদ তৈরী নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে। ব্রাজিল সরকার ঘোষনা করেছেন গম থেকে ইথানল তৈরী করা হবে না। কিন্তু ইথানল জ্বালানী চালিত গাড়ি ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে। ফ্লেক্সি কার - যা পেট্রোল ও ইথানল - দুটিকেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। চেষ্টা চলছে পেট্রোল ও ইথানলের তুলনামূলক হার কমানো। অর্থাৎ এমন গাড়ি তৈরী করা যা পেট্রোলের থেকে ইথানল ব্যবহারেই বেশি উপযোগী হবে।

আমাদের রাজ্যে ভাত ও গুড় থেকে দেশি মদ তৈরি হয়। অভিজ্ঞ আবগারী অফিসাররা বেসরকারি ভাবে, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় স্বীকার করেন, চোলাই এর উৎপাদন ও ব্যবহার আইনসিদ্ধ দেশি মদ বা 'বাংলা' থেকে কম নয়, হয়ত বা বেশি। সুতরাং যদি চোলাই ভাঁটি গুলিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, সঠিক ডিষ্টিলেশন, সঠিক গুনমান বজায় রাখার সুবাদে লাইসেন্স দান করে বৈধ করে তোলা হয় তবে তৎক্ষনাৎ

যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তা হল ঃ

ক। চোলাই-এর মান ও গুণ নিয়ন্ত্রন করা (Quality control) যার ফলে বিষক্রিয়ায় গণমৃত্যুর সম্ভাবনা বাতিল হয়।

খ। রাজস্ব আদায় বাড়ে।

গ। উদ্বৃত্ত অ্যালকোহল শিল্পে, বিশেষত জ্বালানী প্রস্তুতিতে ব্যবহার ও রপ্তানী করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

ঘ। সামাজিক ভাবে চোলাইসেবী গরীব মানুষকে অমর্যাদা ও হেনস্থা থেকে বাঁচানো যায়।

পরিশেষ ঃ যারা বৈধ মদ পান করেন তাদের হিসেব একটা পাওয়া যায়। তেমন সমীক্ষাও হয়েছে। তেমন একটা সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতের জনসংখ্যার ০.৮% মানুষ মদ্য (বৈধ) পান করে থাকেন। অন্য একটি সমীক্ষা মতে, প্রচলিত (যেমন হাড়িয়া, তাড়ি, ছাং) ও বে-আইনি দেশি (যেমন - চোলাই) মদ্যপায়ীদের ধরলে ভারতীয় জনগনের ২.৭% মদ্যপায়ী। সরকারীভাবে কোনও সমীক্ষা নজরে পড়লো না। যদিও তা একান্ত দরকার। ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে মদ্যপানের পরিসংখ্যান থাকাটা বিভিন্ন কারনেই আবশ্যক মনে হয়। এরাজ্যে উৎপাদিত দেশি মদের পরিমাপটা ও তা উৎপাদনের হার, খাদ্যের জোগানে ঘাটতি না সৃষ্টি করেও, আর কতটা বাড়ানো যেতে পারে তার বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা করা দরকার। জ্বালানি হিসেবে উদ্বৃত্ত অ্যালকোহল উৎপাদন করে এই রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ণ ঘটানো যেতে পারে এমন ভাবে যাতে গ্রামীন মানুষ সরাসরি তার ফল লাভ করবেন। সবই অবশ্য নির্ভর করছে সরকারি নীতি ও সদিচ্ছার ওপর।

কৃতজ্ঞতা ঃ শ্রী প্রদীপ রায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাম্প্রতিক রচনা / রিপোর্ট।

1. en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil

2. http//:www.wbexcise.gov.in

With Best Compliments from :

AIMBEE

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015

Contact No. : 9330446711 (2. p.m. to 8 p.m.)

Service for

■ Pest control ■ Dusting & Cleaning ■ Book Preservation

■ White Ant Treatment

■ Termite Control

■ General Order Supply

References :

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office, etc.)

Colleges (Libraries & Laboratories)

Banks

Central & State Government Offices

আলোর পথযাত্রী

পূরবী ঘোষ

আলোকিত প্রদীপের নীচে যেমন থাকে ঘন অন্ধকার, ঠিক তেমনি আমাদের এই ঝলমলে সভ্য সমাজেরও একটা অন্ধকার দিক আছে। অন্ধকার দিকের বাসিন্দারা বাস করে এক অন্ধকার জগতে। একদিকে আলোর হাতছানি, আর অন্যদিকে না পাওয়ার বেদনা। এই দুই মিলিয়ে এই জগতের বাসিন্দারা বিশেষত শিশুরা, তলিয়ে যেতে পারে আরও অন্ধকারে। এই আলো ঝলমলে সমাজটা তাদের দিকে স্নেহের ও সম্মানের হাত বাড়ায় না। অসম্মান, অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের - মধ্যে হারিয়ে যায় তাদের শৈশব। ফলে তারা ডুবে যেতে থাকে অশিক্ষা ও অসামাজিকতার অন্ধকারে।

এই শিশুদের জীবন থেকে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে একদল সমাজ সচেতন মানুষ এগিয়ে এলেন। গড়ে তুললেন নীহারকা। 2001 সালের 24 শে জুন শুরু হল এই প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা। অনেক আদর্শ স্বপ্ন আর প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হল নীহারিকার পথ চলা। ছোটবড় মিলিয়ে 30 টা ছেলেমেয়ের থাকা খাওয়া বড় হয়ে ওঠার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন যে মানুষটি তাঁর নাম কুনাল লামা।

জন্মসূত্রে দার্জিলিং এর বাসিন্দা হওয়া সত্বেও ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্বা ইত্যাদি সমস্ত রকম বাধাকে দূরে ঠেলে দিয়ে শুধুমাত্র সমাজের অবাঞ্ছিত অবহেলিত শিশুদের মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। একদিকে প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা সংগ্রহ, অন্যদিকে অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁর দরকার হয়েছিল কয়েকজন সহকারীর। 2003 সালের 15 ই আগষ্ট এই সহকারীদের একজন হয়ে 'নীহারিকায়' আসার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। দীর্ঘ সাতটা বছর কাটিয়েছি এখানে। কর্মী হিসাবে ঢুকে কখন যে সংগঠকদের একজন হয়ে উঠেছিলাম বুঝতে পারিনি। যাই হোক 'নীহারিকার' একেবারে ভেতরের চেহারাটা দেখে চমকে গেছিলাম। তিরিশটি ছোটবড় ছেলেমেয়ের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিয়ে বসেছে 'নীহারিকা' অথচ কোরনকম সরকারী বা বিদেশী সাহায্য নেই। তাতে আগ্রহও নেই 'নীহারিকার'। শুধুমাত্র চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু বন্ধু শুভানুধ্যায়ী ও সামাজিক কাজে অংশ নিতে আগ্রহী কিছু মানুষের সাহায্যেই সমস্ত দিক থেকে বেড়ে উঠছে এই ছেলেমেয়েরা এরা স্কুলে পড়ে। স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে কলেজেও পা রেখেছে অনেকে। অনেকে আবার কলেজ পার করে পৌঁছে গেছে M S W, BT ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষানবিশীতেও। লেখপড়া ছাড়াও এরা নাটক করে, আবৃত্তি করে। এদরে মধ্যে কেউ কেউ আবার সংগীত ও নৃত্যকলাতেও বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। গ্রিটিংস কার্ড আঁকায় এরা হার মানায় আচ্ছা আচ্ছা আঁকিয়েদেরও।

হাসি গান আনন্দ ঝগড়া খুনসুটির মধ্য দিয়ে কেটে যায় এদরে দিনগুলো। কিন্তু শুধুই আনন্দ আর নাচ-গান নয়, কুনালবাবু নজর রাখেন এদের মানবিক গুণাবলীর দিকেও। এই ছেলেমেয়েরা যাতে সমাজ-সচেতন হয় তার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। সুনামির মত বিধ্বংসী বিপর্যয়ে এই শিশুরা একমাস দুধ না খেয়ে সেই পয়সা জমিয়ে সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছে। সিঙ্গুর -নন্দীগ্রামের বিপর্যস্ত মানুষদের ত্রাণশিবিরে পাঠিয়েছে নিজেদের জামাকাপড় কম্বল ইত্যাদি।

এইভবেই মানুষ গড়ার নিরলস প্রচেষ্টায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কুনালবাবু। কোনরকম প্রচারের আলোয় আসতে তাঁর ঘোর আপত্তি। তিনি বিশ্বাস করেন কোন বিদেশী সাহায্য বা কর্পোরেট হাউসের সাহায্য না নিয়েও শুধুমাত্র চারপাশের মানুষের সাহায্যের হাত ধরেই বড় হবে এরা। তাই কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে নদীয়া জেলায় রানাঘাট মহকুমার অখ্যাত এক গ্রামে নিজের কাজ নিয়ে মেতে আছেন তিনি। তাঁর স্বপ্নের অঞ্জন আমার চোখেও লেগে গেছে, তাই কুনাল লামার মতোই স্বপ্ন দেখি প্রত্যাশা করি নীহারিকা থেকে গড়ে উঠবে সত্যিকারের মানুষ। যারা অন্ধকার ঘুচিয়ে সত্যি করেই সমাজটাকে আলোকিত আধুনিক করে তুলবে।

যোগাযোগ ঃ
নীহারিকা আনুলিয়া শালবাগান
রানাঘাট, নদীয়া
ফোন নং - 9434823197 কুনাল লামা
9432147588 পূরবী ঘোষ

শ্যামলীদি

উনত্রিশ বছর আগে, ১৯৮২ সালের ছয়ই আগষ্ট বিজ্ঞান ও সমাজকর্মীদের উদ্যোগে কলকাতায় এক বড়সড় পরমানু অস্ত্রবিরোধী মিছিল ও সমাবেশ হয়েছিল। বৃষ্টি মাথায় করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে মিছিল গিয়েছিল শহীদ মিনারে। ঠিক ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের দল সেখানে গান গাইবে। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে মিছিল হলেও গানের অনুষ্ঠান পন্ড হল। কিভাবে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে শ্যামলীদি এসেছিলেন। সঙ্গে করে আনা লিফলেট ও পুস্তিকা বিলিয়েছিলেন। অনেক পরে জেনেছি শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে ফিরে আসার আগে যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কানাডা থেকে আমেরিকায় গিয়ে বার তিনেক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। একবার ছেলে শিশু আনন্দ সহ। অথচ তাঁর নিজের মুখে এসব কথা কখনো শুনিনি।

সে বছরই শ্যামলীদির ডাকে পৌষমেলায় শান্তিনিকেতন গেলাম। আমি আর জ্যোতি (জ্যোতির্ময় সমাদদার)। শ্যামলীদির আঁকা যুদ্ধবিরোধী ছবি ও পোষ্টার দিয়ে স্টল সাজিয়ে, লিফলেট নিয়ে বসেছিলাম। সেবার 'পলাশ' বাড়িতে মাটির পাত্রে খিচুড়ি আর লাবড়া খেয়ে আমরা তো মুগ্ধ।

শ্যামলীদির কাঁধে থাকতো জামা-কাপড় বইপত্রের একাধিক ব্যাগ। এবং স্লাইড প্রোজেক্টর। সুযোগ পেলেই হিরোসিমার স্লাইড দেখাবেন। পরে যোগ হয়েছিল রাজস্থানের রাওয়াতভাতা পারমানু চুল্লির কাছের গ্রাম ঝাড়জানিতে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের ছবি স্লাইড। আরও পরে যদুগোড়ার ইউরেনিয়াম মাইনিংএর ফলে আক্রান্ত অসহায় মানুষের ছবি ও ভিডিও। ১৯৮২ সাল থেকেই কলকাতায় আমাদের হিরোসিমা দিবস পালন শুরু হয়। শ্যামলীদি আসতেন। সে সময় নানা জায়গায় এ বিষয়ে বলতে যেতেন। অনেক পরে তাঁর উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে ওই দিবস পালন করা শুরু হয়।

১৯৯৮ সালে তামিলনাড়ুর ডিংডুগালে মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেলের এক মিটিং-এ ঠিক হল রাজস্থানের —রাওয়াতভাতা পরমানু চুল্লির সংলগ্ন এলাকায় মানুষের বিচিত্র অসুখ ও ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি নিয়ে সমীক্ষা চালানো হবে। ডিংডুগালে শ্যামলীদি উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু সমীক্ষার সময় গেলেন। অসুস্থ মানুষের ছবির স্লাইড তৈরী করে আনলেন। স্লাইড ও প্রজেক্টর সঙ্গে রাখতেন, সুযোগ পেলেই দেখাতেন পরমানু বিদ্যুতের উজ্জ্বল ছবির আড়ালে কি ঘটে।

৮৯ সালে কলকাতার পরমানু গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সারাদিনের কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের পরমানু শক্তি সংস্থার কয়েকজন কর্তা ব্যক্তিও বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে পরমানু বিদ্যুতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিকাশ সিংহ বক্তব্য রাখার পরই সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শ্যামলীদি তার পিছু ধাওয়া করলেন - এ কি কথা, আমাদের বক্তব্য শুনুন, প্রশ্নের উত্তর দিন। বিকাশবাবু সেবার কোনওক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। কনভেনশানের কয়েকমাস পর থেকে প্রকাশ শুরু হয় 'শেফ এনার্জি অ্যান্ড এনভারণমেন্ট' ত্রৈমাসিক। ৯৪ সাল পর্যন্ত তা চলেছিল। শ্যামলীদি বেশ কয়েক কপি নিয়ে বিক্রি করতেন, পত্রিকার সদস্য করতেন।

'অনুমুক্তি' পত্রিকার সুরেন্দ্র ও সংঘমিত্রা গাদেকার এক সময় সমীক্ষার কাজে যদুগোড়া এলেন। শ্যামলীদি বেশ কিছুদিন সেখানে ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে তেজস্ক্রিয় দূষণে আক্রান্ত যদুগোড়া ও সংলগ্ন এলাকার কয়েকশো অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েকে একত্রিত করে ইউরেনিয়াম মাইনিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। আক্রান্ত ছেলেমেয়ে ও মানুষের ছবি তুলে এনে সবাইকে দেখাতেন। ওই অসুস্থ, বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিতে পারে এমন কিছু স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য নানা মহলে আবেদন করেছেন, কেউ এগিয়ে আসেনি।

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে পান্নালাল দাশগুপ্ত ও রাখালবাবু সহ দু-তিনজন বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কয়েক বছর তাদের নিয়ে তুমুল ব্যাস্ত ছিলেন। পরে তাঁদের কোনও আত্মীয়দের সমালোচনা - অভিযোগে মানসিক ক্লান্তি এসেছিল। কিন্তু তাতে কী, সারা জীবনইতো অন্যের সেবা করে এসেছেন। লেখা-পড়ায় বিঘ্ন

হত, অনুযোগও করেছেন। কিন্তু সে কাজ থেকে সরে আসতে পারেননি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ১৯৮৭, ২০০০ ও ২০০৬ সালে তিন দফায় যথাক্রমে দাঁতন, সুন্দরবন ও হরিপুরে পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। বিশেষ করে ২০০০ ও ২০০৬-৭ সালে সরকার অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমরাও তেড়েফুঁড়ে সভা-সমিতি-মিছিল, লেখালেখি শুরু করি। বিরোধীতায় শ্যালমীদি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে।

২০০০ এবং ২০০৬-৭ দুই দফাতেই সরকারকে পিছু হঠতে হয়েছিল। অবশেষে মমতা সরকার ঘোষনা করল, হরিপুরেতো নয়ই, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে না, তাতে আমাদের কাজ কমলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি কারণ ভারত সরকার নানা রাজ্যের পরমানু বিদ্যুৎ বিকাশে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ করতে হচ্ছেই। গত এপ্রিল মাসে চেরনোবিল দিবসে কোলকাতার মেট্রো চ্যানেলে পরমানু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় শ্যামলীদি এসেছিলেন। ততদিনে লাঠি ধরেছেন। বিচ্ছিরিভাবে পা ফুলছে। বললেন, পোকা কামড়েছে (অসুস্থ হবার পর দুর্গাপুরের হাসপাতালে জেনেছিলাম, শ্যামলীদির পায়ে ডিপ ভেইন থম্বোসিস হয়েছে, পোকার কামড় নয়। এখন ভাবি কতটা মনের জোর থাকলে সেই পা নিয়েও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছুটে বেড়ানো জারি রেখেছিলেন।

চৌঠা জুন শিয়ালদার লরোটো ডে স্কুলে নাট্যকার বাদল সরকারের স্মরণ সভায় এলেন। পরেরদিন ৫ই জুন, বিশ্বপরিবেশ দিবস। ওই স্কুলেই পরমানু শক্তির বিপদ নিয়ে সাড়া দিনের কর্মশালা। শুরুতে গান্ধীজিকে নিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের বই প্রকাশ করলেন। তারপর সারাদিন ধরে নানাজনের বক্তব্য শুনলেন, বললেন। হল ভর্ত্তি, ঘর ভর্ত্তি শ্রোতা নিয়ে পর পর দুদিনের অনুষ্ঠানের পর তাঁকে মানসিকভাবে অনেক চাঙ্গা মনে হল। অসুস্থ হবার আগে সেই শেষ দেখা।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর নানা বেঠিক কাজ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, পাঁচিল তোলার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়েছেন। এসব কারণেই নিরঞ্জনদা (হালদার) তাঁকে বলতেন শান্তিনিকেতনের বিবেক, সমরদা (বাগচী) বলতেন সেখানকার হৃদয়। তাঁর ছুটে বেড়ানোর ক্ষমতা দেখে আড়ালে, ঘনিষ্ঠমহলে মমতা নামটাও চালু হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা তার মজ্জায় মিশেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাতে কখনো উগ্রতার ঝাঁঝ ছিল না, ভালা-মন্দ, পছন্দ অপছন্দে আপসও ছিল না। ভোগ বিলাস এবং মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র ঘৃণা। পাঁচিল তোলা নিয়ে লড়াই জারি রেখেই অসুস্থ হলেন।

গান্ধীবাদী বলতে একমাত্র শ্যামলীদিকেই দীর্ঘদিন ধরে কাছ থেকে দেখেছি। অপারমানবিক, ক্রেটিডকার্ডহীন, বড় বড় মলহীন, কম প্রয়োজন, অল্পে তুষ্ট, সামাজিক ন্যায়ে অভ্যস্থ পৃথিবীর স্বপ্ন বুকে ধরে রেখে অমিতব্যয়ী, ভোগবাদী, স্বার্থপর, দেখানেপনায় তৃপ্ত বাস্তব পৃথিবীতে শ্যামলীদি কখনো একা হতে হতে অবসাদগ্রস্থ হয়েওপড়েছেন। অল্প সময়ে তা কাটিয়ে উঠে আবার যে কে সেই।

হাসপাতালের বিছানায় অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থাতেও যতক্ষণ জ্ঞানে ছিলেন বারবার বলেছেন, ভালো আছি। দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে ভর্ত্তিহবার দিন কয়েক পর থেকে ধীরে ধীরে কথা বলা বন্ধ হয়ে আসছিল। ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পর গিয়েছিলাম। একদিন হাত ধরে অনেক কথা বলার চেষ্টা করলেন। কথা জড়ানো, কিছুই বোঝা গেল না। এই স্বাধীনচেতা, অকুতোভয় মানুষটি যে আর থাকবেন না তখনো মনে হয় নি।

অল্প কিছু মানুষ আছেন যাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে যতটুকু নেন, ফিরিয়ে দেন অনেক বেশি। অনেক পাওয়ার সুযোগ থাকতেও এত অল্পে জীবন কাটান - যা দেখে আমরা শিখি - সুন্দর, সুস্থভাবে বাঁচতে অনেক লাগে না, দৃষ্টি বড় করাটাই আসল কাজ। অনেক সুযোগ, সম্মান তাঁরা এড়িয়ে চলেন। শ্যামলীদির ক্ষেত্রে যোগ হয়েছিল আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য - পৃথিবীকে পরমানু মুক্ত করার আকাঙ্খা ও জেহাদ, পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়া, অল্প কথা সুন্দর করে বলা, অন্যের যত্ন নেওয়া, অতিথি সেবা। এইভাবে শিল্পী শ্যামলী খাস্তগির তুলি, কালি, ফেলে হয়ে উঠেছিলেন আমাদের অন্তরের শ্যামলীদি।

প্রদীপ দত্ত

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়ে

"বেলেঘাটা-ফুলবাগান অঞ্চলের একজন একনিষ্ঠ সমাজকর্মী অপূর্ব মুখার্জী গত ২০১০-এর ৭ই আগষ্ট ৫৬ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন"। আপাত ভাবে অপূর্বর পরিচয় এইটুকুই। কিন্তু আমরা, যারা ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু মানুষজন, সমাজ নিয়ে দেশ নিয়ে একটু আধটু ভাবনা চিন্তা করি, তাদের কাছে অপূর্বর পরিচয় আর-ও অনেক বেশি। তাই আজ একবছর পরেও আমাদের মনে হয়েছে অপূর্বকে, বিশেষ করে ওর বিশাল কর্মকান্ডকে আরও অনেকের কাছে তুলে ধরার দরকার। আজকের দিনে সমস্ত রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মে অনাগ্রহী তরুন প্রজন্মের কাছে অপূর্বর কর্মকান্ড একটি দৃষ্টান্ত।

আমার সঙ্গে অপুর পরিচয় হয় ১৯৭৫ সালে জারী হওয়া জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে। তখন গোটা দেশ জুড়ে একটা দমবন্ধ করা অবস্থা। মিছিল মীটিঙ সব বন্ধ। সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম বন্ধ। চার দিক থেকে ধর-পাকড় আর পুলিশি নির্যাতনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিচ্ছু করার নেই। অথচ কিছু একটা করার জন্য প্রাণ ছটফট করছে। এই সময়ে একদিন অসিত দা বললেন 'বালী জুট মিলে'র অস্থায়ী শ্রমিক বস্তির ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা সান্ধ্য স্কুল চালাতে। আমাকে সাহায্য করার জন্য অসিত দার সঙ্গে একটি ছিপছিপে চেহারার এক মুখ দাড়িওয়ালা ছেলে আমাদের বাড়িতে হাজির হল। নাম বারীণ রায়। এই বারীণই অপু এটা জেনেছিলাম অনেক পরে। কথা-বার্তায় অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্ট বক্তা, এটা প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম।

কালী মিলের সান্ধ্যস্কুল গড়ে তোলা ও সেখানে নিয়মিত পড়ানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হল বারীণের নতুন এক কাজ। ওর সঙ্গে এসেছিল আর ও দুজন, প্রসূন ও তন্ময়। কিন্তু এরা কেউই স্বনামে আসেনি। যাইহোক, প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে ওরা এসে যেত, রাত ৮টা পর্য্যন্ত চলত পড়ানোর কাজ। কিন্তু বারীণের কাজের ধরণ ছিল আলাদা। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এলাকার শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার কাজও চালিয়ে যেত। কারখানার অবস্থা, শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি ছিল ওর আলোচ্য বিষয়। অপুর কাজের কেন্দ্র বিন্দুতে সবসময়েই থাকত দুস্থ অভাবী বিপদগ্রস্থ মানুষ। আমাদের সান্ধ্য স্কুলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কোথায় ছেলেমেয়েদের জন্য বই জোগাড় করতে হবে, ওদের খাতাপেন্সিল দিতে হবে, ছুটল বারীণ। এবং জোগাড় করেও আনল। এই ভাবে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া আসার পথে, কখন ও আমার বাড়িতে বসে ও বলে যেত ওর নানা ধরনের সংগঠন ও কাজের কথা। বালীতে যখন স্কুল করছে, বেলেঘাটায় তখন গড়ে তুলছে 'ইষ্ট-ক্যালকাটা সোশিও কালচারাল অর্গাইজেশন"। একদিকে গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশ নিয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার মূলক কাজ, আবার অন্য দিকে নাটক ও গণসংগীতের দল গড়ে মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ার কাজ, সবেতেই সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা রাখত অপু।

সামাজিক কাজ করতে গিয়ে ও কিন্তু কখনই পরিবারিক দায় দায়িত্বের কথা ভুলত না। অকালে মাতৃহীন অপু সংসারের কাজ ভাগ করে নিয়েছিল দিদির সঙ্গে। জল তোলা থেকে রুটি করা সব কাজই দিদির সঙ্গে সমান ভাবে করে ও বাইরের গঠন মূলক কাজে অংশ নিত।

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বালীর স্কুলটা যখন একটু একটু করে স্থিতিশীল হচ্ছিল, ছাত্রছাত্রী-র সংখ্যাও বাড়ছিল ঠিক তখনই টনক নড়ল মিলের কর্মকর্তা ও এলাকার প্রভাবশালী বাম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের। বস্তি এলাকায় একটা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরী করে স্কুলটাকে তুলে দেওয়া হল।

স্কুল উঠে গেল। কিন্তু বারীণ থেমে গেল না। বারীণের খোলস খুলে স্বনামে ও আবার ডুব দিল আরও নতুন নতুন কাজে। মানসিক রোগীদের চিকিৎসা সংগঠন 'মানস' থেকে শুরু করে A.P D.R. C.R.L.I C.R.G.U M.K.P ইত্যাদি সব সংগঠনেই প্রথম সারির কর্মী অপূর্ব মুখার্জী।

জীবিকার প্রয়োজনে বাড়িতে পড়নো শুরু করলেও পরে সেটাকেও একটা সামাজিক সংগঠনে পরিণত করেছিল অপু। নাম দিয়েছিল "এবং ছাত্রছাত্রী"। অল্প পয়সায় অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক কাজেও তাদের দায়িত্বশীল করে তোলার কাজ-ও চলতে লাগল। কোথায় আমলাশোলে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, চলল অপু তার ছাত্র-ছাত্রীর কাহিনী নিয়ে চাল-ডাল যোগাড় করে ত্রাণ দিতে। কোথায় বন্যা হয়েছে খবর পাওয়া মাত্রই ত্রাণ নিয়ে সেখানে ছুটে গেল 'এবং ছাত্র-ছাত্রী'র দল আর তাদের অপুদা।

পারিবারিক সূত্রে অপু হঠাৎ তার দিদিমার দেওয়া কিছু টাকা পেয়ে যায়। কিন্তু ঘরের কাজে সে টাকা ব্যয় না করে অপু কিনে আনল কিছু টেষ্ট পেপার। সেগুলো বিলি হল গরীব দুস্থ পড়ুয়াদের মধ্যে। তারপর বেশ কয়েকবছর ধরেই "এবং ছাত্রছাত্রীদের" সঙ্গে নিয়ে কাজটাকে চালু রেখেছিল অপু। এইভাবেই নানাবিধ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখত অপু। কিন্তু জানত না নিজের শরীরের খবর। অজান্তে কখন যেন পাকস্থলীতে দানা বেঁধেছিল মারণরোগ ক্যান্সার। রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল চিকিৎসা। হল অপারেশন। সুস্থ হল শরীর, ব্যস্ মাথায় আবার খেলতে শুরু করল নতুন নতুন কাজের পরিকল্পনা। রোগটাকে একেবারে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আত্মীয় বন্ধু কাছের জনেদের পরামর্শে দেওয়া হল কেমোথেরাপি। আশ্চর্য, প্রথম কিস্তির কেমোথেরাপি দেওয়ার পরেই হাসিখুসী অনর্গল কথা বলা মানুষটি একেবারে কুঁকড়ে গেল। বন্ধ হল কথা। গলায় বুকে অসহ্য কষ্ট। কষ্টের লাঘব হল একেবারে মৃত্যুতে। এমন লড়াকু হাসিখুসী, মিশুকে অপুর মৃত্যু কিসে হল? অসুখে? নাকি অসুখের চিকিৎসার ভুলে? এ প্রশ্ন রয়েই গেল সবার মনে।

অপূর্বর বিরাট কর্মচঞ্চল জীবনটার পরিসমাপ্তি এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়ায় ওর পরিবারের সঙ্গে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত। সব সংগঠনেই ওকে বড় দরকার, কিন্তু দরকার বললেই তো আর পাওয়া যায় না। তাই মেনে নিতেই হয়। ভরসা একটাই অপু চলে গেলেও রেখে গেছে ছেলে অমিত কে আর 'এবং ছাত্রছাত্রী'দের।

পূরবী ঘোষ

ন হন্যতে ঃ শর্মিলা ঘোষ স্মরণে

শর্মিলা ঘোষ, আমাদের শর্মিলা দি আর নেই। মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৩রা জুলাই ২০১১। ব্যাথার চিকিৎসা হিসেবে মোমের প্রলেপ দেওয়ার পরামর্শ ছিল ডাক্তারবাবুর। সেই জ্বলন্ত মোম দুর্ঘটনাবশত শর্মিলাদিকে দগ্ধ করে ফেলে। বেশ কিছু দিন কলকাতার চারণক হাসপাতালে চলে প্রাণপণ প্রয়াস, কিন্তু সবকিছুকে ব্যর্থ করে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে বিওবি'র দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। যখন তিনি বর্ধমানে থাকতেন, তখন থেকে। ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞান চেতনা, বি ও বি, উৎস মানুষ, ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম এবং অন্য কিছু বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংগঠনের বন্ধুরা মিলে আয়োজন করা হয় ''বিজ্ঞান যাত্রা''র। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে চলেছিল নেই বিজ্ঞান যাত্রা। সেই সূত্রেই শর্মিলা দি আর বর্ধমান পি এস এ (পিপলস্ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন) এর বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্রপাত। বর্ধমানে নারী গ্রামে শর্মিলাদিদের বাড়ী। সেই বাড়ীতে যে কত বার গিয়ে থেকেছি, কখনও একা, কখনও দল বেঁধে। আমরা যারা কলেজে পড়ি, হোস্টেলে থাকি, তাদের কাছে শর্মিলাদির বাড়ী ছিল অবাধ আশ্রয়। নিশ্চয়ই অসুবিধা হত। কিন্তু তা বোঝার সুযোগ দূরে থাক, যে পরম যত্নে আর সমাদরে শর্মিলাদি আর ছোট বোনেরা, মাসিমা ও মেসোমশাই আমাদের গ্রহণ করতেন তাতে সংকোচ করার অবকাশও পাইনি।

বাড়ির অর্থনৈতিক দায়িত্বের অনেকটাই ছিল শর্মিলাদির। তিনি তখন ছিলেন বর্ধমানের রায়নার একটা স্কুলের গণিত শিক্ষিকা। এই স্কুলটির আগে মালদার গাজলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর প্রথম চাকরি।

কলেজের পড়া সমাপ্তির পর আমি, বিলু (বিপ্লব) আর সুদীপ্ত আশুতোষ শীল লেনের বাড়িটির (যেখানে কালধ্বনির অফিস, বৃহস্পতিবার বি ও বি'র সান্ধ্য আড্ডা বসে) দোতলায় থাকতে লাগলাম। কলকাতায় এলেই শর্মিলাদি ঠিক চলে আসতেন। আমাদের সব ঠিকঠাক চলছে কিনা, অসুবিধা হচ্ছে কিনা, দিদির জানা চাই। বহু অনুষ্ঠানে, মিছিলে, আড্ডায় তাঁকে আমরা পেয়েছি।

বিয়ের পর শর্মিলাদি বর্ধমান ছেড়ে চলে আসেন শ্রীরামপুরে ৯০ দশকের গোড়ায়। প্রথমে ভাড়া বাড়ি তারপর নিজেদের বাড়িতে। চাকরি সূত্রে উত্তরবঙ্গে, কৃষ্ণনগরে ঘুরে আমিও শ্রীরামপুরে এলাম। জানতাম না শর্মিলাদিরা শ্রীরামপুরে থাকেন। যোগাযোগ কমে গেছে ততদিনে। শর্মিলাদি বড়া মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছেন ১৯৮১ সালে থেকে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অন্য সামাজিক কর্মকান্ডে। হুগলী জেলার এ পি ডি আর -এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শ্রমজীবি হাসাপাতালের জন্যও প্রচুর পরিশ্রম করে গেছেন, তার জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত। আর অহল্যা'র সঙ্গে তার সম্পর্ক বহু পুরোন। দেখা হলেই আমাদের বলতেন, শ্রীরামপুরে ওদের বাড়িতে যাবার জন্য। ঠিকানা নির্দেশ সব পেয়েছিলাম - কিন্তু যাওয়া হয়নি। শর্মিলাদির অনুযোগ আর অভিমান তাই শেষ হয়নি। টুকরো টুকরো কত কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ট্যাংরায় বি. প্রেমানন্দের ''অলৌকিক, নয় নিছক ম্যাজিক'' প্রদর্শনীর পর শর্মিলাদির নৃত্য পরিবেশনা। বন্ধুদের জন্য। দোতলায় একটা ঘরে। তার সঙ্গে সকলেই এমন নাচ জুড়ে দিল যে নিচ তলা থেকে ভাড়াটেরা অতিষ্ঠ হয়ে ছুটে এলেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর 'শঙ্খচিল' গান ও তার সঙ্গে নৃত্য শর্মিলাদির খুব প্রিয় ছিল। 'বিজ্ঞান যাত্রা'-র সময়ে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাকে ঐ গান গাইতে শুনেছি। ''ও আলোর পথযাত্রী'' গানটাও মনে পড়ছে তার কণ্ঠে।

শর্মিলাদির মৃত্যুর পর শ্রীরামপুরে স্মরণ সভায় তাঁর অনেক ছাত্রী, সহকর্মী এসেছিলেন, এসেছিলেন নাগরিক আন্দোলনের বহু কর্মী প্রতিবেশী সাধারণ মানুষ। সকলের কাছেই তাঁর নির্মল হৃদয়ের উত্তাপ রেখে গেছেন শর্মিলাদি। আনুষ্ঠানিকতার বাধা ডিঙিয়ে বহুমানুষের হৃদয়ের আবেগ আর কণ্ঠরোধী যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সেই সভায় শর্মিলাদিকে সঠিকভাবে চিনিয়ে দিল। তাঁর স্মরণে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই। নাম 'জীবন টা নয় ব্যক্তিগত'। সত্যদার (সত্যব্রত কর) মৃত্যুর পর শর্মিলাদি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তারই একটি লাইন থেকে ঐ নামাকরণ।

যতটা পেরেছেন যেখানেই তিনি থেকেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও সমাজের জন্য আগামীর জন্য কিছু করার, কিছু গড়ার চেষ্টা ছাড়েননি।

প্রথম জীবনের অর্থনৈতিক সংকট, প্রিয় জনের কাছ থেকে আসা মানসিক আঘাত কোনও কিছুই তাঁর জীবনের উচ্ছ্বাসকে, নির্মল হাসিটিকে ম্লান করতে পারেনি। চোখ বুজলেই স্নেহময়ী 'দিদি' টির হাসি মুখ দেখতে পাই।

শিবু

বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা

সুদেব সিংহ

তিনি যেন ছিলেন পুরাণ কল্পের সেই আগুন রক্ষক-এর মত। সারাজীবন পালন করেছেন অগ্নিরক্ষার ব্রত। কারণ বাদল সরকারের যাবতীয় শিল্প সৃষ্টির 'আদিতম প্রেরণা' ছিল, তাবৎ পৃথিবীর, সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ। তাই জীবনের উপান্তে এসেও প্রায় এই একবিংশ শতকে classical-term এ বলতেন "জনতার কাছে যার, তাই নাটক করা"। "এছাড়া আমার কোন উপায় নেই"। "নাটক না করে উপায় নেই।"

বাদল সরকারের জন্ম ১৫ই জুলাই, ১৯২৫ সালে কলকাতায়। বাবা মহেন্দ্র লাল সরকার, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রথমে অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ। মা সরলামোনা সরকার। পিতৃদত্ত নাম সুধীন্দ্র সরকার কিন্তু বৃষ্টি বাদলের দিনে জন্ম বলে কাকা বলেছিলেন এ ছেলের নাম বাদল। বাদল সরকার পেশায় ইঞ্জিনিয়ার - নগরস্থপতি। পড়াশুনো করেছেন শিবপুর বি.ই কলেজে - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্স-এ। চাকরী সূত্রে ইঞ্জিনিয়ার তথা টাউন - প্ল্যানার হিসেবে কাজ করেছেন নাগপুর, মাইথন, কলকাতা, লন্ডন, কিংস্টন প্রভৃতি জায়গায়। এরপর নাইজেরিয়া, এন্ড-তে যোগ দেন প্রিন্সিপ্যাল - টাউনপ্লানিং - অফিসারের পদে।

তাঁর নাট্য-কাজের দিকে ফিরে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে গোড়া থেকেই নতুন এক নাট্য ভাষার তিনি খোঁজ করছেন, যে নাট্যভাষায় প্রযুক্ত হবে তাঁর অভিপ্রেত discourse। সেই প্রথমদিকের নাটক 'সলিউংন -এক্স (১৯৫৬), পিসিমা (১৯৫৯), রাম শ্যাম যদু-র (১৯৬১) যুগ থেকেই এটা স্পষ্ট। বড়পিসিমায় দেখা গেল নাটকের মধ্যেই আর এক নাটক গড়ে ওঠার আখ্যান।

আধুনিক ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ থরথর কম্পমান হয়েছে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩) যখন রচিত - প্রকাশিত - অনুবাদিত হয়ে অভিনীত হল। এরপর তা লেখকের কথায় সেই ভুতে ঘাড়ে ভর করে লিখিয়ে নেওয়ার যুগ ১৯৬৩ -৬৮। বাংলা নাট্য সাহিত্যে যুক্ত হল 'বাকি ইতিহাস' 'শেষ নেই' 'পরে কোনদিন' 'যদি আর একবার' 'পাগলা ঘোড়া', বল্লভপুরের রূপকথা, ত্রিংশ শতাব্দী, প্রলাপ, প্রভৃতি নিত্যস্মরনীর নাটক এই উপমহাদেশের প্রায় সব ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছে নাটকগুলি এবং এখনও হয়ে চলেছে নিয়মিত অভিনয়। শুধু আমাদের সোনার পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম। বিশেষত গত ১৫ বছর এর নাট্য দলগুলির অসংখ্য প্রযোজনার মধ্যে প্রায় একটি জায়গাও পাননি বাদল সরকার।

১৯৭১ এ বাদল সরকার ঘটালেন এক চমকপ্রদ কান্ড। গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন' (১৮৯৩) নাটকটিকে 'অ্যাডাপ্ট' করলেন। ভূমিকায় লিখলেন রচনা-গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বিকৃতি বাদল সরকার। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না পৌরানিক এই নাটকে মঞ্চে প্যান্ট-জামা পরে সরাসরি নেমে পড়লেন খোদ বাদল সরকারেরই চরিত্রে। ইতিমধ্যে ১৯৬৭ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতাব্দী নাট্যদল। বাদল সরকার পেয়েছেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৭/৬৮), পদ্মশ্রী খেতাব, (১৯৬৯) পরবর্ত্তী সময়ে পেয়েছেন পদ্মভূষণ খেতাবও, কিন্তু দুবারই গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে পাড়ি দিয়েছেন পূর্ব ইউরোপে। অন্যদিকে বল্লভপুরের রূপকথা, সাগিনা মাহাতো এবং অতি অবশ্যই আবু হোসেন-এর হাত ধরে শতাব্দী দল পৌঁছে গেছে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চের ৭০০ আসন একেবারে হাউসফুল। এহেন সময়ে বাদল সরকার সিদ্ধান্ত নেন প্রোসেনিয়াম মঞ্চে (যা তাঁর ভাষাতে বিদেশী অমদানী) আর নাটক তিনি করবেন

না। কারণ তার বিশেষ তাড়া আছে। তাঁকে পৌঁছাতে হবে একেবারে যাকে বলে হাটে-মাঠে-বাটে।

১৯৭২-এ অঙ্গন মঞ্চে স্পার্টাকুস অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্তের রঙ্গালয়কে চিরবিদায় জানিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন মাঠ-ঘাটের ভূখা মানুষদের মধ্যে। গড়ে তুললেন তৃতীয় ধারার নাট্য আন্দোলন। ফ্রি থিয়েটারের অস্ত্রে শান দিলেন। পাঠক স্মরণ করবেন সময়টা বারুদ-গন্ধী সত্তরের দশক। ইতি-উতি প্রাকাশ্য দিবালোকে দেখা যায় মানুষের মৃতদেহ। সুলভ, নমনীয়, বহনীয় এই তিনটি ভিত্তি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নাটক নিয়ে পৌঁছে গেলেন সুন্দরবনের কাছে রাঙ্গাবেলিয়ার মত প্রত্যান্ত সব গ্রামে। আর শালবনি শহরের একটা কারখানার গেট থেকে আর একটা কারখানার গেটে। শুধু নিজেদের শরীর কে প্রপস হিসেবে সম্বল করে প্রয়োজিত হল মিছিল (১৯৭৪) ভোমা (১৯৭৫) 'সুখাপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' (১৯৭৬), 'হট্টমালা ওপারে' ও গন্ডী (১৯৭৭) 'বাসি খবর' (১৯৮১) প্রভৃতি তৃতীয় ধারার নাটক।

যুক্ত ছিলেন এক সময়ে অভিক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গেও। সারা জীবন পরমানু বিরোধী আন্দোলনের সাথে নিবিড়-ভাবে যুক্ত। নিজেই বলেছেন "পরমানু-শক্তি বিরোধিতা আমার অবসেশন-এর মত" "কিছুতেই মানতে পারি না"। এই অবসেশন এর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তার অসংখ্য নাটকের মধ্যে।

২০১১-র ১৩ই মে - এই সেদিন চলে গেলেন বাদল সরকার আমাদের চির বিদায় জানিয়ে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাঁর জীবননাট্যের অবসানকে ঘিরে আছড়ে পড়ল এক ভয়াবহ বিতর্ক। অসংখ্য গণমাধ্যমের দ্বারা জানা গেল সেই অভাবনীয় অভিযোগ যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বিষপ্রোয়োগের (ঘুমের ওষুধ) কারনে। কিন্তু এহ বাহ্য। একেই বুঝিবা নাটকের ভাষায় বলে পোয়েটিক জাস্টিস্ অথবা ট্রাজিক্ আয়রনি। তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি কাজ মিলে সারা জীবন জুড়ে পরমানু বিভীষিকার ভয়াবহতা কিম্বা পৃথিবী জোড়া বঞ্চনার মারাত্মক বহর দেখে অন্তর্দাহে ক্রমাগত দগ্ধ হন নি কি তিনি? তাই তো মানুষকে কাছে টেনে নেবার জন্য তাঁর অমন বুক ভরা আকুতি। কিন্তু হলে কি হবে! যে বাংলাভাষা ছিল তাঁর প্রকাশের মূল মাধ্যম সেই বাঙলা সংস্কৃতির বিদগ্ধ জনেরা তো তাঁকে কবেই বিস্মরণের প্রদেশে নির্বাসনে পাঠিয়ে এর আগেই রচনা করে রেখেছিলেন একটি হত্যার নাট্যকথা।

"অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট'

'২০১১ সাল একটি বিপ্লবের বৎসর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দারিদ্র, শোষণ এবং হিংসার ওপর নির্ভরশীল অচল এক বিশ্বব্যবস্থার শেষের শুরু হিসেবেও। আরব দুনিয়ার এক ডজন দেশের নাগরিকরা ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং নিপীড়নকারী শাসনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে একনায়কদের বিতাড়িত করেছে। সারা বিশ্ব তাদের কাজে অনুপ্রাণিত। গ্রীস, আইসল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, ব্রিটেন, চিলি, উইসকনসিন ও অন্যত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে ব্যায়সঙ্কোচ ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার হরণের প্রতিবাদ করেছেন।'

'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিটে'র ওয়েব সাইটের বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবেই। আমরা ভারতে বসে সমস্ত রকম মিডিয়া শাসিত অবস্থানে থেকেও প্রায় অজ্ঞ। ঐ ওয়েব সাইটই জানাচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ মেনস্ট্রিম মিডিয়া তাদের অবজ্ঞা (Ignore) করেছে। তাই ইউটিউব, ফেসবুক টুইটার প্রভৃতি সোসাল নেট ওয়ার্কই হয়ে উঠেছে বিপ্লবের বার্তা বহনকারী মাধ্যম। জানা যাচ্ছে এই আন্দোলনের মূল কারণ হল ২০০৮ সালের থেকে চলে আসা অর্থনৈতিক মন্দা। যার ঘা লেগেছে আমেরিকা ও ইউরোপের বিত্তশালী (এসিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন অ্যামেরিকার তুলনায়) ও সুবিধা পেয়ে আসা মানুষদের জীবন যাত্রায়, যারা এত দিন বিশ্বের সম্পদ আর শক্তির সিংহ ভাগটাই ভোগ করে আসতে পারছিলেন। ডলার আর ইউরোর বিশ্বব্যাপী দাপট কে কাজে লাগিয়ে বাকি দুনিয়ায় রাজা রাজড়ার মতো জীবন কাটাতে পারছিলেন। তারা ঘা খেয়ে পথে নেমেছেন। আমরা যারা নিত্য দিনের মন্বন্তরের মধ্যে, ক্ষুধা আর শোষণের মধ্যে জন্মাই আর মরি যে দেশের গরীব মানুষকে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করে গুলি খেয়ে মরতে হয়, তাদের কাছে ফেসবুক-টুইটার সম্বলকারী আন্দোলন কতটা অর্থবহণ করে! তবে ওঁদের লক্ষ্য বা সিদ্ধান্তগুলো পড়ে একটা অবিশ্বাসী আগ্রহও যে জাগে না তা নয়। আন্দোলন যেখানে হয়ে উঠেছে একটা উৎসব। হাজার মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে যৌথ রান্নাঘরে, তাঁবুতে থাকছেন শত শত মানুষ, নানা দেশের নানা ভাষার। খোলা হয়েছে লাইব্রেরি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চলছে গান, বিতর্ক, ধর্না আর বিক্ষোভ। তাঁরা বলছেন "একটা বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, যাকে থামানো যাবে না"।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে শুরু। এখনও চলছে। জুকোট্টি পার্কে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। তাঁরা ধনী আর গরীবের বৈষম্য দূর করতে চান। চান এমন সরকারি ব্যবস্থার অবসান যা কিছু সংখ্যক মানুষের সুবিধার জন্যই রচিত ও পালিত হয়, বেশি সংখ্যক মানুষের বঞ্চনার সুবাদে। একটা দোলাচল নিয়ে মাঝে মধ্যে চোখ চলে যাচ্ছে আন্দোলনকারী ওয়েবসাইটিতে। তার ঠিকানা - occupywallst.org.

শ. ন.

আমরির বীভৎস হত্যাকান্ড - বহু প্রশ্নের উত্তর চায়

মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু, যেন মৃত্যুর মিছিল। না স্বাভাবিক পরিণত বয়সের মৃত্যু বা রোগভোগের মৃত্যুর কথা বলছিনা। বলছি আকস্মিক অপঘাত অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কথা, যেমনটি ঘটল বর্ষশেষে - 2011 -এর ডিসেম্বরে ঘরের কাছে, হাটের মাঝে। একেবারে বে-আব্রু বেসামাল করে দিয়ে গেল ভদ্র-সভ্য শোভন সুন্দর মোড়কের ভিতরটিকে। 9ই ডিসেম্বর কলকাতার অভিজাত স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমরি'র কথাই বলছি। সঙ্গতিসম্পন্ন বা স্বল্প সঙ্গতির যে সব রোগী সেখানে ঐ অভিশপ্ত রাতে ভর্তি ছিলেন, তাঁরা কেউই চালচুলোহীন ছিলেন না। খরচ হয়তো বেশীই কিন্তু তবুও ভালো চিকিৎসা পরিচ্ছন্ন পরিষেবা পাওয়া যাবে এই আশা রোগী বা তাঁর প্রিয়জনদের অটুট ছিল; অটুট থাকে বলেই না আমরিতে সর্বদা রোগীর ভিড় উপচে পড়ে। ক্রমশ বেড়ে চলে মালিকদের মুনাফা, চকচকে বহুতল সৌধ হাতছানি দিয়ে ডাকে দূর-দূরান্তরের

জীবন-প্রত্যাশীদেরও। নানা সময়ে নানাভাব বিভিন্ন ইঙ্গিত মিলেছে, আমরা আমল দিতে চাইনি, সরকাও আমল দিতে চাননি - এমনটাতেই আমরা অভ্যস্ত। আমল দিতে চায়নি সরকারি নজরদারি সংস্থাগুলিও। সৌধের বেসমেন্টে জমানো সমস্ত রকমের দাহ্যবস্তুতে আগুন লেগে বিষাক্ত ধোঁয়া শীতল হাওয়া বয়ে নিয়ে যাওয়া পাইপলাইন বেয়ে ছড়িয়ে গেলো বিভিন্ন ফ্লোরের রোগীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। আলোহীন বিদ্যুৎহীন কার্বন মনোক্সাইড কবলিত বদ্ধ মৃত্যুপুরী থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি, ছটফটানি, প্রাণ-পণ প্রয়াসের কিছু ছবি কিছু বর্ণনায় আমরা হয়তো আহত বিচলিত বোধ করেছি। সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তৎপরতা, স্থানীয় বস্তিবাসীদের মানবতা, হাসপাতালের পরিচালকবর্ণ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা ইত্যাদিতে আবার আশ্বস্তও বোধ করেছি নিশ্চয়। কিন্তু এসব কোনকিছুই কোনভাবে স্পর্শ করতে পারবে না সেই হতভাগ্য তিরানব্বই জন রোগমুক্তিকামী মানুষকে যাঁরা রোগ থেকে নয় পৃথিবী থেকেই চিরতরে মুক্তি পেয়ে গেলেন, অসম্ভব অবিশ্বাস্য অতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নীরবে বিদ্রুপে বিধ্বস্ত করে গেলেন আমাদের মত সকল জীবিত সহনাগরিককে - এই হল তোমাদের উন্নত আধুনিক গবেষণাসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনী স্বাস্থ্য পরিষেবার নমুনা! চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন - পারবে কি তোমরা এই ব্যবস্থার রোগগুলো চিহ্নিত করতে? পারবে কি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে? পারবে কি সরকারী নজরদারি ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ও কার্যকরী করে তুলতে? পারবে কি দোষীদের সনাক্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে? পারবে কি রোগীদের হয়ে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে? পারবে কি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) নামক গালভরা কর্মসূচীর নামে সরকারী সম্পত্তি ও পরিকাঠামোকে মুনাফাশিকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার ঢালাও বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে? পারবে কি অসহায় চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীদের অধিকারের আইনী ও ব্যবহারিক স্বীকৃতি দিতে? পারবে কি ঘুষ উপঢৌকন ও সুবিধাদানের অস্ত্রে আইনী বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে পড়া আটকাতে? পারবে কি সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবক্ষয় ঠেকিয়ে বেসকারী স্বাস্থ্যব্যবসার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে? শত করোটি নিঃশব্দ চীৎকারে সহস্র প্রশ্নের কোরাস তুলছে, পারবে কি.... পারবে কি..... পারবে কি ...?

ঠিকই, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে এসব আমরা করে উঠতে আদৌ পারব কিনা বা কতখানি পারব। কিন্তু আপাতত আমরা উত্তেজিত, উচ্চকিত, সরব, কতদিন থাকব তা নিজেরাও জানি না। কারণ আমাদের স্বভাব হাউই-বাজির মত - শব্দ করে উপরে উঠি, আগুনে-ফুলকি ছড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাই। কষ্টকর দীর্ঘমেয়াদী তথ্যানুসন্ধান, যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান ও মানবিকতার কষ্ঠিপাথরে তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, সর্বোত্তম নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষতায় প্রয়োগ এসব আমাদের ধাতে নেই। আমরা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করি কিন্তু বৈজ্ঞানিক পন্থা-পদ্ধতি আমাদের ছোঁয় না।

র. ম.

পুস্তক পরিচিতি

সাংশ্লেষিক জৈব রসায়নের জাদুকর ঃ রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড

পার্থসারথি রায়

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি কাজ করে দিতে রাজী হয়ে গেছিলাম। কাজটি জানা গেল স্বীকৃত হওয়ার কদিন পরে। বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ্ উডওয়ার্ডের বাংলায় রচিত জীবন আলেখ্য নিয়ে আলোচনা - লেখক অধ্যাপক শৈলেশ চন্দ্র কর।

যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলাম - কারণ, সম্পর্কিত বিষয়ে আমার বিশেষ অজ্ঞতা। বহুযুগ পূর্বে স্নাতক শ্রেনীতে জৈব রসায়নের শেষ পাঠ নিয়েছি - তখনও উডওয়ার্ড হফম্যান সূত্রের চলন হয়নি। কুইনিন এর সংশ্লেষক হিসেবে উডওয়ার্ডের নাম জানা ছিল এইমাত্র। তার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী সাংশ্লেষিক জৈব রসায়নের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সাংশ্লেষিক জৈব রসায়নের শিল্প বিন্যাস বা নান্দনিক মাধুর্য্য, সাফল্য ও ''সৃষ্টি সুখের উল্লাস'' - যা শৈলেশচন্দ্র তাঁর লেখায় বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার টীকা ভাষ্য আমার সাধ্যের অতীত। সেজন্য জৈব রসায়নের রস সাধারণ্যে পরিবেশনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছি না - তবু এটুকু নিশ্চই বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের জীবনী নিবন্ধ বিরল - রসায়ন বিদ সম্পর্কত নেই। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের আত্মজীবনী অবশ্য অন্যমাত্রিক।

গ্রন্থটিতে পাই উডওয়ার্ডের ছেলেবেলা থেকে একান্ত অনুসন্ধিসা ও একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের কথা। নিজস্ব পরীক্ষাগার তৈরী করে সেখানে সে যুগের প্রধান রাসাযনিক পরীক্ষণ সংক্রান্ত স্নাতক পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত সমস্ত পরীক্ষা সংশ্লেষন মাত্র ১৪ বছর বয়সেই সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি তে উডওয়ার্ডের প্রতিভা ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর অধ্যাপকেরা তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী গবেষণা চালাতে পারেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁর একেরপর এক সংশ্লেষণ কর্মকাণ্ডের বিবরণও বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক। এছাড়াও আছে সেই সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী - বিশেষতঃ জৈব রসায়নবিদ দের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক বেশ কিছু তথ্য যা একাধারে কৌতুককর ও আলোকপ্রদ। যেমন সমসাময়িক অন্য বিশিষ্ট জৈবরসায়নবিদ রবার্ট রবিনসনের সাথে সম্পর্ক ও আদান প্রদান। হফম্যানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব এবং যৌথকর্ম যে কোন রসায়ণবিদের পক্ষে সুগভীর অনুপ্রেরণা। তেমনই বিস্ময়কর - বি১২ সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর বিশেষ সহযোগীতা। বাদ যায় নি উডওয়ার্ডের পারিবারিক ঘটনাবলী, তাঁর পরিবারবর্গের কথাও - মা থেকে শুরু করে স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেরই। তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা, ব্যায়াম বিমুখতা, ধূমপান প্রীতি সবই জায়গা পেয়েছে। বক্তৃতার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ ''উডওয়ার্ড'' - আর সকলের বক্তৃতার পরিমাণ মিলি উডওয়ার্ডে - অর্থাৎ উডওয়ার্ড এর বক্তৃতার দৈর্ঘ্যের সহস্র ভাগের হিসেবে।

এত সত্ত্বেও গ্রন্থের পরিধি বিশাল নয় - কাজেই সহজপাঠ্য। ভাষা সরল ও সাবলীল। গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যগুলির মধ্যে কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা খতিয়ে দেখা হয়নি, তবে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকলে ভালো হত। বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে যেমন কুইনিনের পৃথকীকরণের সময় ১৮২০র বদলে ১৯২০ ছাপা হয়ে গেছে। বানান ভুলও বেশ কিছু আছে, কয়েকটি বিদেশী উচ্চারণের বঙ্গানুবাদও সঠিক নয়। ত্রুটিগুলি আশা করি সংশোধিত হবে। তবে গ্রন্থটিতে জৈব রসায়ন বিশেষতঃ সাংশ্লেষিক রসায়নের শিল্প সত্ত্বা প্রকাশ করার সুপ্রয়াস সর্বত্রই দেখা যায়। একজন বড় মাপের বিজ্ঞানী, বিশেষত রসায়নবিজ্ঞানী কি করে গড়ে ওঠেন এবং কাজ করেন তার প্রামাণ্য বিবরণ বাংলাভাষায় দুর্লভ। এটি নিশ্চই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন এবং আশাকরি পাঠক সাফল্য লাভ করবে।

সাংশ্লেষিক জৈব রাসায়নের যাদুকর ঃ
রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড - শৈলেশ চন্দ্র কর, ১৫০ টাকা
২৪৮, সুভাষ কর্নার, পলতা
পরিবেশক ঃ স্বপন বুক স্টল, ৯০, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

Vigyan O Vigyankarmi Rs. 35.00 Vol. XXXIII No. 1- 4

Rn. No. 34929/79 January 2011 - December 2011

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি অফসেট, কলি - ৯ থেকে মুদ্রিত।